দ্বিতীয় খণ্ড।

চন্দননগর।

গ্রন্থ-প্রচার সমিতি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
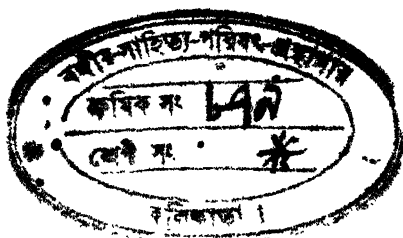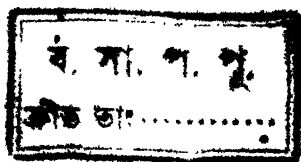
আনন্দমঠ।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

উৎসর্গ।

*   *   *   *

ক্ব নু মাং ত্বদধীনজীবিতং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

*   *   *   *

স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থ এরূপ উৎসর্গ হইল।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১২শ অধ্যায়।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়।

সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।

ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

The leading idea of the plot is this—should the national mind feel justified in harbouring violent thoughts against the British Government? or to present the question in another form, is the establishment of English supremacy Providential in any sense? or to put it in a still more final and conclusive form with what purpose and with what immediate end in view did Providence send the British to this country? The immediate object is thus briefly described in the preface—To put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal; and the mission is thus strikingly pictured in the last chapter:—The physician said, Satyanand, be not crest fallen. Whatever is, is for the best. It is so written that the English should first rule over the country before there could be a revival of the Aryan faith. Harken unto the counsels of Providence. The faith of the Arya consisteth not in the worship of three hundred and thirty millions of gods and goddesses; as a matter of fact that is a popular degradation of religion—that which has brought about the death of the true Arya faith, the so-called Hinduism of the Mlechhas. True Hinduism is grounded on knowledge, and not on works. Knowledge is of two kinds, external and internal. The interna Eknowledge constitutes the chief part of Hinduism. But internal knowledge can not grow unless there is a development of the external knowledge. The spiritual cannot be known unless you know the material. External knowledge has for a long time disappeared from the country, and with it has vanished the Arya faith. To bring about a revival, we should first of all disseminate physical or external knowledge. Now there is none to teach that; we ourselves cannot teach it. We must needs get it from other countries. The English are profound masters of physical knowledge, and they are apt teachers too. Let us then make them kings. English education will give our men a knowledge of physical science, and this will enable them to grapple with the problems of their inner nature. Thus the chief obstacles to the dissemination of Arya faith will be removed, and true religion will sparkle into life spontaneously and of its own accord. The British Government shall remain indestructible so long as the Hindus do not

once more become great in knowledge, virtue and power. Hence "O Wise man refrain from fighting and follow me," This passage embodies the most recent and the most enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good. The author's dictum we heartily accept, as it is one which already forms the creed of English education. We may state it in this forms ; India is bound to accept the scientific method of the west and apply it to the elucidation of all truth. This idea beautifully expressed, forms a silver thread as it were and runs through the tissue of the whole work.

The Liberal,
8th April, 1882.

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসীবিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।

আরও দেখিবেন যে, দুইটী ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল। আর CAPTAIN EDWARDES নামের পরিবর্ত্তে MAJOR WOOD নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কেন না উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, তাহা রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়া, এই সংস্করণে আবশ্যক পরিবর্ত্তন করা গেল। অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা গিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল। মুদ্রাঙ্কন-কার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত করা গেল।

আনন্দমঠ

উপক্রমণিকা।

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অনন্ত-শূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য-অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছু কাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব।"

"তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে, ঠিকানা নাই। আজ হাট-বার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুকুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতী বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর একসন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী, কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে সকলে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান—কিন্তু আজ ধনী নির্দ্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকন্যা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিলেন, "এরূপে কদিন চলিবে?"

কল্যাণী বলিল, বড় অধিক দিন নয়। যত দিন চলে; আমি যত দিন পারি চালাই, তারপর তুমি মেয়েটী লইয়া সহরে যাইও।

মহেন্দ্র। সহরে যদি যাইতে হয়, তবে তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই? চল না, এখনই যাই।

পরে দুই জনে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল।

ক। সহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?

ম। সে স্থান হয় ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায় শূন্য হইয়াছে।

ক। মুরশিদাবাদ, কাশিম-বাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এ স্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্ত্তব্য।

মহেন্দ্র বলিলেন, "এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ; ইহা যে সব চোরে লুঠিয়া লইবে!"

ক। লুঠিতে আসিলে আমরা কি দুই জনে রাখিতে পারিব? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে? চল, এখনও বন্ধ-সন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি, ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।"

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা দুইজন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে দুইজনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোরুগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কন্যাটীকে কোলে লইয়া, রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুঠেড়া ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।" এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, "যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।" এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?"

কল্যাণী আসিয়া একটী বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলি-সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা-গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর-গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। মেয়েটী মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয়। একবার এক নিবিড় শ্যামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুম-সংযুক্ত

লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিল। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া, মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্চন করিলেন।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুইজনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য হয় না। অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নি-তরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী-কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে! মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী-কন্যাকে একটী ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক-হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, তুমি একটু সাহস করিয়া একা থাক; দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব। এই বলিয়া একটা মাটীর কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল-কুক্কুরের রব। ভাবিতেছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন, চারিদিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটী দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ

দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্ম্ম-বিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর একটা আসিল, তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়-অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্চ্ছিত হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেই খানে উপস্থিত হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষে স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়াভ্যন্তর্গত সৌন্দর্য্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক—বনে ফুল আছে; ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল; তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে, ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়—যৈ কিছু অল-

স্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোণা-রূপা লইয়া কি করিব, এক-খানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। "চাল দাও", "চাল দাও" "ক্ষুধায় প্রাণ যায়," সোনারূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক-জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল-কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই! আজ এই বেটাকে খাই!" তখন সকলে "জয় কালী!" বলিয়া, উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। "বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব!" এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খল খল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দল-পতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকমকি সোলায় আগুন করিয়া সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্ত্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জ্জুর প্রভৃতি শ্যামল পল্লবরাজি, অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, এক-জন শবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, "রাখ, রও রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুক্‌ন মাংস কেন খাই? আজ

যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব; এস ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর একজন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়াছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল, যে, সে স্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া কন্যার মুখে স্তনটী দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া মার মার শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটীর গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, মেয়েটী মধ্যেমধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চিৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া অনেকদূর বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকার সকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চিৎকার করিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল—কন্যাটী ভয়

পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময় স্থানে বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি! যাহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!" এই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অবসাদে, কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন, যে, দেবর্ষি গগনপথে বীণাযন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন; তাঁহার মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন শুভ্রবসন মহাশরীর মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোক-প্রদীপ্ত নীলাকাশপথে গায়িতেছেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

ক্রমে আরও নিকট—আরও স্পষ্ট—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকারবিমিশ্র চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্ত্তি! অন্যমনে তথাভূত চেতনে,

কল্যাণী মনে করিলেন প্রণামকরিব কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ড সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটী বড় মঠ আছে। পুরাণতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারিতেন ইহা পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল - তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে। অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত এবং বহিঃস্থিত বন্যবৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে, দিনমানে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে, এখানে কোঠা আছে। অট্টালিকা সকল অনেক স্থানেই ভগ্ন, কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে, সে সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। দেখিলেই জানাযায় যে, এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে। এই মঠের একটী কুঠারীমধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রবসন মহাপুরুষ। কল্যাণী বিস্মিতলোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, "মা! এ দেবতার ঠাঁই শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে, তুমি খাও, তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।"

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্থৈর্য্য হইলে, গলায় আঁচল দিয়া সেই মহাত্মাকে একটী প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহান্তর হইতে একটী সুগন্ধ মৃৎপাত্র বাহির করিয়া সেই জলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন, "মা কন্যাকে কিছু খাওয়াও আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিবে।" কল্যাণী হৃষ্ট চিত্ত কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ "আমি যতক্ষণ না আসি, কোন চিন্তা করিও না" বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির

হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই; দুগ্ধ যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে, অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, 'মা! তুমি দুধ খাও নাই আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।"

সেই ঋষিতুল্য পুরুষ এই বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, কল্যাণী আবার তাঁহাকে প্রনাম করিয়া যোড়হাত করিলেন—

বনবাসী বলিলেন, "কি বলিবে?"

তখন কল্যাণী বলিলেন, "আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোন বাধা আছে। আমি খাইব না।"

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, "কি বাধা আছে, আমাকে বল—আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে, আমাকে বলিবে না? আমি যখন বন হইতে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আনি, তৎকালে তোমাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বোধ হইয়াছিল, তুমি না খাইলে বাঁচিবে কি প্রকারে?"

কল্যাণী তখন গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, "আপনি দেবতা, আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এ পর্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিংবা তাঁহার ভোজনসংবাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব?"

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়?"

কল্যাণী বলিলেন, "তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।" তখন ব্রহ্মচারী একটী একটী করিয়া প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু তার আর পরিচয়ের পর ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী?" কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া যে অগ্নিতে দুগ্ধ তপ্ত হইয়াছিল, অবনতমুখে তাহাতে কাষ্ঠপ্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমার বাক্য পালন কর, দুগ্ধ পান কর, আমি

তোমার স্বামীর সংবাদ আনিতেছি। তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না।” কল্যাণী বলিলেন, একটু জল এখানে আছে কি?” ব্রহ্মচারী জলকলস দেখাইয়া দিলেন। কল্যাণী অঞ্জলি পাতিলেন, ব্রহ্মচারী অঞ্জলি পূরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন, “আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।” ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন, “আমি অমৃত পান করিয়াছি—আর কিছু খাইতে বলিবেন না—স্বামীর সংবাদ না পাইলে আর কিছুই খাইব না।” ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, “তুমি নির্ভয়ে এই দেউলমধ্যে অবস্থিত কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠে কি আছে, কে আছে, দেখা যাইতেছে না। মাঠ যেন অনন্ত জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই মাঠ দিয়া মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা। রাস্তার ধারে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের উপর অনেক আম্রাদি বৃক্ষ। গাছের মাথা সকল, চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া সর সর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার ছায়া কালো পাথরের উপর কালো হইয়া তর তর করিয়া কাঁপিতেছে। ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিখরে স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—কি শুনিতে লাগিলেন বলিতে পারি না। সেই অনন্তশূন্য প্রান্তরেও কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্ম্মর শব্দ। এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল। উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল। সেখানে কি শব্দ হইল বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেই দিকে

গেলেন। নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মনুষ্য বসিয়া আছে। মানুষ সকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র; বিটপবিচ্ছেদে নিপতিত জ্যোৎস্নায়, তাহাদের মার্জ্জিত আয়ুধ সকল জ্বলিতেছে। এমন দুই শত লোক বসিয়া আছে – একটী কথাও কহিতেছে না। ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহাদিগের মধ্যে গিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোন শব্দ করিল না। তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন, যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন পাইতেছেন না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া একজনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবাপুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত – সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে চন্দনশোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, "ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ?"

ভবানন্দ তখন বলিল, "মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী কন্যা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে—"

এই পর্য্যন্ত বলিতে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "চটীতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানি। কে করিল?"

ভবা। গেঁয়ো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের চাষাভূষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজ কাল কে ডাকাত নয়? আমরা আজ লুটিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, "চোরের হাত হইতে আমি তাঁহার স্ত্রী-কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। 'এখন' তোমার উপর ভার যে মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া

তাঁহার স্ত্রী-কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দাও। এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।”

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী কন্যার অনুসন্ধান করিবেন এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন। কিছু দূর গিয়া পথিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ী ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় আর ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ্ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই—কেন না মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা গাড়ী-বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানির ধনাগারে যাইতে-ছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ

জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের অধ্যক্ষ একজন গোরা। গোরা সর্ব্বপশ্চাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা পথে চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজনার গাড়ী ও সৈন্য সামন্তে মহেন্দ্রের গতিরোধ হইল। মহেন্দ্র সিপাহী ও গরুর গাড়ী কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া দাঁড়াইলেন তথাপি সিপাহীরা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যায়—দেখিয়া এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া তিনি পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একজন সিপাহী বলিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈ।" মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল এবং "শালা—চোর—" বলিয়াই সহসা এক ঘুসা মারিল, ও বন্দুক কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্তহস্তে কেবল ঘুসাটা ফিরাইয়া মারিলেন। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশী হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ঘুষটা খাইয়া সিপাহী মহাশয় ঘুরিয়া অচেতন হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারিজন সিপাহী আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের নিকট লইয়া গেল এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি একজন সিপাহীকে খুন করিয়াছে। সাহেব পাইপ খাইতেছিলেন, মদের ঝোঁকে একটুখানি বিহ্বল ছিলেন, বলিলেন "শালাকো পাকড়লেকে সাদি করো।" সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কি প্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু নেশা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে, বিবাহ করিতে হইবে না, বিবেচনায় তিন চারিজন সিপাহী গাড়ীর গরুর দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াই বা কি হইবে? স্ত্রী-কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর, বাঁচিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজানা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃদুগম্ভীরপদে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিল, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

সে সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তা সকল ছিল না। নগর-সকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, মুসলমান সম্রাট-নির্ম্মিত অপূর্ব্ব বর্ত্ম দিয়া আসিতে হইত। মহেন্দ্রও পদচিহ্ন হইতে নগর যাইতে, দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে যাইতেছিলেন। এই জন্য পথে সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর। যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরাৎ ধন-রক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও মহেন্দ্রের ন্যায় সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন। একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল যে, এই চালান লুঠ করিবার জন্য ডাকাতেরা অবশ্য চেষ্টা করিবে, তাতে আবার পথিমধ্যে একজন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্রিকালে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল যে, এও আর একজন ডাকাত। অতএব সিপাহীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকেও ধৃত করিল।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাপু?"

সিপাহী বলিল, "তোম্ শালা ডাকু হো"

ভবা। দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়াবসন-পরা ব্রহ্মচারী আমি, ডাকাত কি এই রকম।

সিপাহী। অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতি করে।

এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের গলাধাক্কা দিয়া টানিয়া আনিল। ভবানন্দের চক্ষু সে অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল! কিন্তু তিনি আর কিছু না বলিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভু, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

সিপাহী ভবানন্দের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "লেও শালা মাথে পর একঠো মোট লেও।" এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের

মাথার উপর একটা তল্পী চাপাইয়া দিল। তখন আর একজন সিপাহী তাহাকে বলিল, "না; পলাবে। আর এক শালাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এ শালাকেও গাড়ীর উপর সেইখানে বেঁধে রাখ।" ভবানন্দের তখন কৌতূহল হইল যে, কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ মাথার তল্পী ফেলিয়া দিয়া, যে সিপাহী তল্পী মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহার গালে এক চড় মারিলেন। সুতরাং সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অন্যমনস্কে কোলাহল করিতে করিতে চলিল, আর গোরুর গাড়ীর চাকার কচ্‌কচ্‌ শব্দ হইতে লাগিল। তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র-মাত্র শুনিতে পায়, এইরূপ স্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা বলি, সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ীর চাকার উপর রাখ।"

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ীর চাকার নিকট একটু-খানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধনরজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তারপর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ীর উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তব্ধ।

যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পথে ইহাদিগের যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা পৌঁছিলে দেখিল যে, পাহাড়ের নীচে একটা ঢিপির উপর একটা মনুষ্য দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া, হাওয়ালদার বলিল, "আরও এক শালা ঐ। উহাকে

ধরিয়া আন। মোট বহিবে।" তখন একজন সিপাহী তাহাকে ধরিতে গেল। সিপাহী ধরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিলেন, "উহার মাথায় মোট দাও।" সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ীর সঙ্গে চলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটী পিস্তলের শব্দ হইল, হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। "এই শালা হাওলদারকে মারা" বলিয়া একজন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথার মোট ফেলিয়া দিয়া পিস্তল উলটাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল, সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সেই সময়ে "হরি! হরি! হরি!" শব্দ করিয়া দুইশত শস্ত্রধারী লোক আসিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকে না। তখনই সিপাহীরা চারিদিকে সম্মুখ ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্ব্বার আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এমন সময়ে হঠাৎ সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া লইল। লইয়াই একাঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্ন শির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে হরি হরি শব্দ করিতেছে এবং "সিপাহী মার, সিপাহী মার," বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্য কাহারও নিকটে আজ্ঞা না পাইয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাক্স-সকল

হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়ন-পর হইল।

তখন যে ব্যক্তি ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া ছিল এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্বগ্রহণ করিয়াছিল, সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই জীবানন্দ সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।"

জীবানন্দ বলিল, "ভবানন্দ! তোমার নাম সার্থক হউক।" অপহৃত ধন যথাস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করণে জীবানন্দ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গসহিত শীঘ্রই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া একজন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। কেন না, দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের দুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কে ?

ভবানন্দ বলিল, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি ?"

মহে। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান্!

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন—এ যে কুকাজ—ডাকাতি।" ভবানন্দ বলিল, হউক

ডাকাতি, আমরা তোমায় কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।”

মহেন্দ্র। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি উপকার করিবে? আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অনুপকৃত থাকাই ভাল।

ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমারই ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, “সে কি?”

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিল। অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা কি রকম দস্যু?

দশম পরিচ্ছেদ।

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্ব্বিত, কিছু কৌতূহলী।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে স্থিরমূর্ত্তি, ধীরপ্রকৃত সন্ন্যাসী আর নাই; সেই রণনিপুণ বীরমূর্ত্তি—সেনাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্ত্তি আর নাই। এখনই যে গর্ব্বিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে মূর্ত্তি আর নাই। যেন জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তিশালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর কানন-নগ-নদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল—সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথা-বার্ত্তার জন্য বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন,—

“বন্দে মাতরম্ *
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।”

---

* মল্লার কাওয়ালী তাল যথা—বন্দে মাতরং ইত্যাদি।

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল, "মাতা কে ?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন :

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা,—"

তখন বুঝিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গায়িলেন ;—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্ সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥
সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্।

সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্ ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গাহিতে গাহিতে কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র, তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কারা?"

ভবানন্দ বলিল, "আমরা সন্তান।"

মহেন্দ্র। সন্তান কি? কার সন্তান?

ভব। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। ভাল—সন্তানে কি চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পূজা করে? সে কেমন মাতৃভক্তি?

ভবা। আমরা চুরি-ডাকাতি করি না।

মহে। এই ত গাড়ি লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি-ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার।

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে, এ টাকায় তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভাগ।

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা কি?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন দিন উড়িয়া যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজিও দেখিলাম।

মহে। ভাল করে দেখনি, একদিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখ্‌লাম, একবার বই ত দুবার মরব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ! তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা, তুমিও তা। কেবল দুধ ঘির জম। দেখ সাপ মাটিতে বুক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ, যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী,

দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটী খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশে রাজার সঙ্গে রক্ষণা-বেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোর দেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?

মহে। তাড়াবে কেমন করে? ভবা। মেরে।

মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে না কি?

দস্যু গায়িল:—

"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

মহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একা?

ভবা। কেন, এখনি ত দুশ লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সন্তান;

ভবা। সকলেই সন্তান।

মহে। আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে।

মহে। না হয় দশ বিশ হাজার হল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে?

ভবা। পলাশীতে ইংরেজের ক জন ফৌজ ছিল?

মহে। ইংরেজ আর বাঙ্গালীতে?

ভবা। নয় কিসে? গায়ের জোরে কত হয়—গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটে?

মহে। তবে ইংরেজ মুসলমানে এত তফাৎ কেন?

ভবা। ধর, এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পালায়—শরবৎ খুঁজিয়া বেড়ায়,—ধর, তার পর, ইংরেজের জিদ্ আছে—যা ধরে তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি। টাকার জন্য প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না। তার পর শেষ কথা সাহস—কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়্‌বে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে দুশ জন পলাইবার দরকার নাই। কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পালায় না।

মহে। তোমাদের এ সব গুণ আছে?

ভবা। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।

মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর?

ভবা। দেখিতেছ না, আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য। কার্য্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে—আমরা আবার গৃহী হইব। আমাদেরও স্ত্রী-কন্যা আছে।

ম। তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ—মায়া কাটাইতে পারিয়াছ?

ভবা। সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই—তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে? যে বলে, আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না, বা সে মিছা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে?

মহে। আমার স্ত্রী-কন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবা। চল, তবে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুইজনে চলিল, ভবানন্দ আবার "বন্দে মাতরম্" গায়িতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গে গায়িল—দেখিল যে, গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে। তখন মহেন্দ্র বলিল, "যদি স্ত্রী-কন্যা ত্যাগ না করিতে হয়, তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।"

ভবা। এ ব্রত যে গ্রহণ করে, সে স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে, কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—পক্ষিকূজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে, আনন্দময় কাননে, "আনন্দমঠে," সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্য বদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন যে, "চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেইখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নব রুণপ্রফুল্ল প্রাতঃকালে যখন নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও

সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতরে কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজমূর্ত্তি, শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমান-প্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি রুধির-প্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান রাগ-রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাস করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ?" মহেন্দ্র বলিল, 'পাইতেছি।"

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি? ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে? ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।"

মহেন্দ্র। কে তিনি? ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি! মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্র। মা—যা ছিলেন। ম। সে কি?

ব্র। ইনি কুঞ্জর-কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু-সকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন।

মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, "কালী।"

ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল-মালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাতে খেটক খর্পর কেন?"

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল—বন্দে মাতরম্।

"বন্দে মাতরম্" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলি-লেন,—"এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্ভুজা"—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগ্ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।" তখন দুই জনে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে এক কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে মহেন্দ্র গদ্‌গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?”

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।”

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার স্ত্রী কন্যা কোথায়?”

ব্রহ্ম। চল—দেখিবে চল।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব।

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে? ম। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম। কোথায় বিদায় দিবে?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এ মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব?”

ব্রহ্ম। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিতে পাইবে। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেই-খানে ভক্ষ্যসামগ্রী পাইবে। তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা অভিরুচি তাহা করিও, এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবে না। তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে, তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোন পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইলেন। মহেন্দ্র পূর্ব্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে সত্যানন্দ অন্য স্বরঙ্গ দিয়া অবতরণ-পূর্ব্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছে। সে ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্রে লুঠের টাকা, ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছে। সত্যানন্দ সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে কেন না, তাহা হইলে

উঁহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যত দিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, তত দিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উঁহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে উঁহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও। আর সময়ে হউক অসময়ে হউক, উঁহাদিগের প্রাণরক্ষা করিও। কেন না, যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল। মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদা-কাটার পর চোখ মুছার ধুম পড়িয়া গেল। যতবার চোখ মুছা যায়, ততবার আবার জল পড়ে। জল পড়া বন্ধ করিবার জন্য কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল। ব্রহ্মচারীর অনুচর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল। দুর্ভিক্ষের দিন অন্ন-ব্যঞ্জন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে, সন্তানের কাছে তাহা সুলভ। সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল আর কেহ পায় না। এইজন্য ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বন্যফল ও কিছু দুগ্ধ আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল। সন্ন্যাসী-ঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে অনেকগুলি গাই ছিল। কল্যাণীর অনুরোধে মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন। তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল। দুগ্ধ কন্যাকে কিছু খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে। তার পর নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রমদূর করিলেন। পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই। কল্যাণী বলিল, "বাড়ীতে বিপদ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা

বাহিরে বিপদ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।" মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা, কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া কোন প্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজন গতক্লম হইয়া কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন্ পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বন হইতে বাহির হইতে পারিলেই পথ পাইবেন কিন্তু বন হইতে ত বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে একজন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাই, হাস কেন?"

গোঁসাই বলিল, "তোমরা এ বনে প্রবেশ করিলে কি প্রকারে?"

মহেন্দ্র। যে প্রকারে হউক, প্রবেশ করিয়াছি।

গোঁসাই। প্রবেশ করিয়াছ ত বাহির হইতে পারিতেছ না কেন? এই বলিয়া বৈষ্ণব আবার হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি হাসিতেছ তুমি বাহির হইতে পার?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি তোমারা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছ, নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "আপনি সন্তান?"

বৈষ্ণব বলিল, "হাঁ, আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।"

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিল; মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া একা বনমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল।

আনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সুরম্য প্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর একদিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ। একস্থানে অরণ্য মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মত কাল। দুই পাশে শ্যামল-শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে নানাবিধ পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে আজ আমি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি। বিপদ যাহা, তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন?"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—আমি আর আপনার নই—আমি কি করিব, বুঝিতে পারি না।"

ক। কেন?

মহে। তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল শুন। এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়া ছিল, মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ গিয়াছে তুমি শুনিয়া আর কি করিবে? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন করে ঘুম আসিয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না - আমি এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো, অতিশীতল মেঘভঙ্গ আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোকময় মূর্ত্তি,—সেখানে শব্দ নাই, অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সর্ব্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয় স্থানে কে বসিয়া আছেন, যেন

নীল পর্ব্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ, যে আমি সে দিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে। যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রীমূর্ত্তি। সেও জ্যোতির্ম্ময়ী; কিন্তু চারিদিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট; বুঝা যাইতেছে যে অতি শীর্ণা, কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রীমূর্ত্তি কাঁদিতেছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া,ঢেউ দিতে দিতে,সেই চতুর্ভুজের সিংহাসন তলে আনিয়া ফেলিল। যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল; এই সে—ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।” তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মত হইল। সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, “তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।”—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে? তখন আবার বাঁশীর শব্দ শব্দ হইল, “আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।” আমি কি বলিলাম, মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।” এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। ভৃঙ্গরাজ কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্য পুষ্পের মৃদু গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদু পবনে মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুই জনে অনেকক্ষণ,

মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

মহেন্দ্র। কি করিব, তাহাই ভাবি—স্বপ্ন কেবল বিভীষিকামাত্র আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিম্ব—চল গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা, তোমাকে যাইতে বলেন, তুমি সেই-খানে যাও—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি—তুমি কোথায় যাইবে?"

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোক ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন, আমিও সেই-খানে যাইব।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে?"

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি, বিষ খাইবে?"

ক। "খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু—"কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিলেন। প্রতি পলকে বৎসর বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী আর কথা শেষ করলেন না দেখিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু—বলিয়া কি বলিতেছিলে?"

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া—বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটা মাটীতে রাখিলেন। তখন দুই জনে ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটী খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটা বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটী একবার বাঁ হাতে ধরিয়া ডাইন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তার পর ডাইন হাতে ধরিয়া বাঁহাতে তাহাকে চাপড়াইল। তারপর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটী খুলিয়া গেল—বড়িটী পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটী পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল, মনে করিল, এও আর একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়িটী তুলিয়া লইল।

কৌটাটী সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটী সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং—সুকুমারী বড়িটী মুখে পুরিল। সেই সময়ে তাহার উপর মার নজর পড়িল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্ব্বনাশ!" কল্যাণী ইহা বলিয়া, কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিলেন তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কৌটা খালি পড়িয়া আছে। সুকুমারী তখন আর একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁত চাপিয়া—সবে গুটীকত দাঁত উঠিয়াছে—মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয় বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য্য লাগিয়াছিল, কেন না, কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল, কল্যাণী বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতেলাগিল।

বটিকা মাটিতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি পেটে গেছে?"

মন্দটাই আগে বাপ মার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালবাসা, সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখন দেখেন নাই যে, বড়িটা আগে কতবড় ছিল। এখন বড়িটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, অনেকটা খাইয়াছে।"

কল্যাণীরও কাজেই সেই বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনিও বড়ি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে, মেয়ে

যে দুই এক ঢোক গিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিছু ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল—শেষ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিল।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে—কল্যাণী, ও কি করিলে।"

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন; বলিলেন, "প্রভু! কথা কহিলে কথা বাড়িবে, আমি চলিলাম।"

"কল্যাণী কি করিলে" বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর! দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও।

মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, "তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিতাম—আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরিতাম, সেই হাতই ত কাটিলে তুমি ছাড়া আমি কি!"

কল্যাণী। কোথায় আমায় লইয়া যাইতে—স্থান কোথায় আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম, ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই। এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া আবার কাঁদিতে

লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠে—আবার বলিলেন, "দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে? আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম ত অবশ্য আর কেহ মারিত। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুইজনে একত্র অনন্ত স্বর্গভোগ করিব।"

এদিকে বালিকাটী একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল—তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময় সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্য মধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইয়াছিল; তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে:—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

তখন কল্যাণী অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বল—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কানননির্গত মধুরস্বর আর কল্যাণীর মধুরস্বরে বিমুগ্ধ হইয়া কাতরচিত্তে ঈশ্বরমাত্র সহায় মনে করিয়া মহেন্দ্রও ডাকিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন চারিদিক্ হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন যেন গাছের পাখীরাও বলিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

নদীর কলকলেও যেন শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন মহেন্দ্র শোকতাপ ভুলিয়া গেলেন—উন্মত্ত হইয়া কল্যাণীর সহিত একতানে ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

কানন হইতেও যেন তাঁহাদের সঙ্গে একতানে শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছে,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষু নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী "হরে মুরারে" ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া, পশুপক্ষিগণকে চমকিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সঙ্গে তেমনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

তখন সেই অনন্তের মহিমায়, সেই অনন্ত অরণ্য মধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশু পক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী—এই চরমগীতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রব উঠিল যে, রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনার চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে। তখন রাজাজ্ঞা

নুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটিতে লাগিল। এখন সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে সে সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না। কেন না, তাহারা ভিক্ষোপজীবী; লোকে আপনি খাইতে পায় না, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবে কে? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা, তাহারা সকলেই পেটের দায়ে কাশী-প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত। আজ গোলযোগ দেখিয়া অনেকেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিল এজন্য বুভুক্ষু রাজানুচরবর্গ কোথাও সন্ন্যাসী না পাইয়া কেবল গৃহস্থদিগের হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গিয়া উদর অর্দ্ধপূরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিতেন না।

সেই কৃষ্ণ-কল্লোলিনী ক্ষুদ্র নদীতীরে সেই পথের ধারেই বৃক্ষ-তলে নদীতটে কল্যাণী পড়িয়া আছে, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদী জমাদার সিপাহী লইয়া, এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত। একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিল, "এই শালা সন্ন্যাসী।" আর একজন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল—কেন না, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী, সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে। আর একজন শষ্পোপরি লম্বমান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল। কিন্তু দেখিল যে একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুই জনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কন্যা বিনা রক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল, বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারি পদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সৎকার হইল না, শিশুকন্যা পড়িয়া

রহিল, এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র জন্তু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুইটা হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, একটানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া একজন সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন। তখন অপর তিন জন তাঁহাকে তিন দিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্ব্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, "আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচজন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।" সত্যানন্দ বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি—আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি, যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচজনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল, কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।" তখন তাঁহারা দুই জনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু? আমি হরিনাম করিয়া থাকি—হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?" সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল "তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয়, তোমার খালাসের হুকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।" তখন ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন:—

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুদ্ধর গমনবিলম্বন অতি বিধুরা সুকুমারী।"
ইত্যাদি।

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতয়াল রাজসরকারে এত্তালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন। সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর; যে যাইত, সে প্রায় বাহির হইত না, কেন না, বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয়—তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন—তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারমধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "আজ অতি আনন্দের দিন। কেন না, আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি? বল হরে মুরারে!" মহেন্দ্র কাতরস্বরে বলিলেন, "হরে মুরারে!"

সত্য। কাতর কেন, বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে এ স্ত্রী-কন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার স্ত্রী-কন্যাকে শৃগালে কুকুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, বড় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। সত্যানন্দ বুঝিলেন, যে, মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছেন না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ।" এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। কি করিলেন, অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহা বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরীক্ষা?"

সত্য। তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদঘাটিত হইল, এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল, "মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম ?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "আমার নাম।"

আগন্তুক বলিল, "তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।"

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন। কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, "মহারাজ ! আপনিও কেন যান না ? আমি আপনার জন্য আসিয়াছি।"

সত্য। তুমি কে ? ধীরানন্দ গোঁসাই ?

ধীর। আজ্ঞে হাঁ। সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে ?

ধীর। ভবানন্দ অমাকে পাঠাইয়াছে। আমি নগরে আসিয়া, আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরামিশান সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যে খাঁসাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামা যোড়া পাগড়ি বর্শা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীর। কেন—সে কি ?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিলে যে ?"

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়েই আজ রাত্রে অন্যপ্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেল। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কাণে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার তাহার প্রতি আদেশ ছিল, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পথিমধ্যে একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাত দিন খায় নাই, রাস্তার ধারে পড়িয়াছিল। তাহার জীবনদান জন্য জীবানন্দ দণ্ড দুই বিলম্ব করিয়াছিলেন। মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন। দেখিলেন প্রভুকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন। • •

জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন।

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে, বসতি বনে বরনারী",

নদীর ধারে আবার কোন মাগী না খেয়ে পড়িয়া আছে না কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিল যে ব্রহ্মচারী স্বয়ং মুসলমান কর্ত্তৃক নীত হইতেছেন। এস্থলে, ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ দেখিলেন, "এ সঙ্কেতের সে অর্থ নয়। তাঁর জীবনরক্ষার অপেক্ষাও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়—এই তাঁহার কাছে প্রথম শিখিয়াছি। অতএব তাঁহার আজ্ঞাপালনই করিব"

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে, নদীতীরে দেখিলেন যে এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন, হইলে হইতে পারে যে ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা। কেন না প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম। যাহা হউক মাতা মৃতা, কন্যাটী জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নহিলে বাঘ ভাল্লুকে খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটীর সং-

কার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম, ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। ভরুইপুরে কতকগুলি সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই, আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমলতৃনাবৃত গোচারণভূমি; কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান; মাঝে নীলজল পরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা। তাহাতে জলে বক, হংস, ডাহুক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছু দূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকাধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই কিন্তু আজ কাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই-কাহারও চালে একটা ময়নার পিঁজরা, কাহারও দেয়ালে আলিপনা - কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলই দুর্ভিক্ষে পীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটা বৃহৎ আম্রকানন মধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারিদিকে মাটির প্রাচীর চারিদিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গরু আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া আছে। একটা বাঁদর ছিল, কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবুগাছ আছে গোটাকত মল্লিকা যুঁয়ের গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়িতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া চরকা লইয়া ঘেনর ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট

মেয়েটী কখন চরকার শব্দ শুনে নাই। বিশেষতঃ মা-ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপ্তমে উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটী সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটী বাহির হইয়াই দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। "এ কি এ? দাদা চরকা কাটো কেন? মেয়ে কোথা পেলে? দাদা তোমার মেয়ে নাকি—আবার বিয়ে করেছ নাকি?"

জীবানন্দ মেয়েটী আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কীল মারিতে উঠিলেন; বলিলেন, "বাঁদরি, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেঁজি-পেঁজি পেলি না কি? ঘরে দুধ আছে?"

তখন সে যুবতী বলিল, "দুধ আছে বই কি, খাবে?"

জীবানন্দ বলিল, "হাঁ, খাব।"

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিলেন। মেয়েটী সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটী ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—বোধ হয়, এই যুবতীকে ফুল্লকুসুমতুল্য সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল। বোধ হয়, উননের তাপের আঁচ মেয়েটীকে একবার লাগিয়াছিল তাই সে একবার কাঁদিল। কান্না শুনিবামাত্র জীবানন্দ বলিলেন, ও নিমি! ও পোড়ারমুখি! ও হনুমানি! তোর এখনও দুধ জাল হলো না?"

নিমি বলিল, "হয়েছে।" এই বলিয়া সে পাথরবাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করে যে এই তপ্ত দুধের বাটী তোর গায়ে ঢালিয়া দিই তুই কি মনে করেছিস আমি খাব না কি?"

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে খাবে?"

জীবা। ঐ মেয়েটী খাবে দেখছিসনে, ঐ মেয়েটীকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিড়ি হইয়া বসিয়া; মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার

চক্ষু হইতে ফোটাকত জল পড়িল। তাহার একটী ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল—

"হাঁা দাদা! কার মেয়ে দাদা?"

জীবানন্দ বলিলেন, "তোর কিরে পোড়ারমুখী?"

নিমি বলিল, "আমায় মেয়েটী দেবে?"

জীবানন্দ বলিল, "তুই মেয়ে নিয়ে কি করবি!"

নিমি। "আমি মেয়েটীকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব মানুষ করিব—" বলতে বলতে ছাই পোড়া চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিল, "তুই নিয়ে কি করবি? তোর কত ছেলে মেয়ে হবে।"

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটী দাও এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। ওটী কায়েতের মেয়ে, আমি চল্লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না। বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও দুটী খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথাও খাব, আবার দুটী খাব? দুইত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটী ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকা ফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের দালনা, পুকুরের রুইমাছের ঝোল এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন, "নিমাই দিদি কে বলে মন্বন্তর? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি"?

নিমি বলিল, "মন্বন্তর আসবে না কেন, বড় মন্বন্তর; তা আমরা দুটী মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই?—তুমি যে সেই চলিয়া

গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই সহরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই"।

জীবানন্দ বলিল, "বোনাই কোথা"?

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, "সের দুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন। কে না কি চাল চেয়েছে।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্-গপ্ টপ্-টপ্ সপ্ সপ্ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথরশূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদর নামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, "দাদা আর কিছু খাবে"?

জীবানন্দ বলিল, "আর কি আছে?"

নিমাইমণি বলিল, "একটা পাকা কাঁটাল আছে।"

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটীকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল, "দাদা আর কিছু নাই।"

দাদা বলিলেন, "তবে যা। আর এক দিন আসিয়া খাইব।"

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে বলিল, "দাদা! আমার একটি কথা রাখিবে?"

জীবা। কি? নিমি। আমার মাথা খাও।

জীবা। কি বল না পোড়ারমুখি। নিমি। কথা রাখবে?

জীবা। কি আগে বল না। নিমি। আমার মাথা খাও—পায়ে পড়ি।

জীবা। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়, কিন্তু কি বল?

নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের অঙ্গুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের

মুখপানে চাহিয়া একবার মাটিপানে চাহিয়া শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, "একবার বউকে ডাকবো।

জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, "আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি একদিন তোর চাল দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বল্‌বার তাই আমাকে বলিস্।"

বলিল, নিমাই "তা হউক আমি বাঁদরী, আমি পোড়ারমুখী। একবার বৌকে ডাক্‌বো?"

জীবা। আমি চল্লুম্। এই বলিয়া জীবানন্দ হনহন করিয়া বাহির হইয়া যায়—নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কবাট রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল "আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারিবে না।"

জীবানন্দ বলিল "আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি তা তুই জানিস্?"

এইবার নিমি রাগ করিল, বলিল "বড় কীর্ত্তিই করেছ—স্ত্রী ত্যাগ কর্‌বে, লোক মার্‌বে, আমি তোমায় ভয় কর্‌বো! তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।"

জীবানন্দ হাসিল, "ডেকে নিয়ে আয়—কোন পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আস্‌বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ্ ফের যদি এমন কথা বল্‌বি, তোকে কিছু বলি না বলি, সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া দিয়া ঘোল ঢেলে ল্যাণ্ডউল্‌টা গাধার চড়িয়ে দেশের বার করে দিব।"

নিমি মনে মনে বলিল, "আমিও তা হলে বাঁচি।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী এক পর্ণ-কুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসন পরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, "বৌ শীগ্‌গির শীগ্‌গির!" বৌ বলিল "শীগ্‌গির কি লো! ঠাকুর জামাই তোকে মেরেছে নাকি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?"

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, "তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে বল্?" সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কি লো তুই খেপেছিস্ না কি?"

নিমাই দুম্ করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল, "শাড়ী বের কর।"

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য,—কেন না এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন, ফুল্লকুসুমতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য; তৈল নাই—বেশ নাই—আহার নাই—তবু সেই প্রদীপ্ত, অনন্তময় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসন-মধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময় বেশভূষা নাই—তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি। সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না) হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া দিল। বলিল, "কি লো নিমি, কি হইবে?" নিমাই বলিল, "তুই পরবি।" সে বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে?" তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে। সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন ত ঢাকাই শাড়ী কেন? চল্ না এমনি যাই।" নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, "চল এই ন্যাকড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" কিছু-

তেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, কোথায় গোলাপজলের কার্ব্বা মুখআঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধূপ-ধূনা-গুগ্গুল্ ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে ত দেখিতে পাইল না। তার পর দেখিল, গৃহাঙ্গণে একটা ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তধারণ করিল। বলি না যে, তাহার চক্ষে জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন যে, তাহার চক্ষে যে স্রোতঃ আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল, "ছি কাঁদিও না, আমি জানি তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য কাঁদিও না—তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিনবস্ত্র কেন? তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই।"

শান্তি বলিল, "তোমার ধন, তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানি না। যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে—"

জীবা। গ্রহণ করিব—শান্তি! আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিয়াছি?

শান্তি। ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে, যবে আবার আমায় ভালবাসিবে—

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শান্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন, "কেন দেখা করিলাম।"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার ত ব্রত-ভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রত-ভঙ্গ হউক্—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমি এই জন্য নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই। তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। একদিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার; একদিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ; সবই একদিকে আর একদিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না যে, কোন্ দিক্ ভারি হয়। দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? দেশের লোকের দুঃখ,—যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রন্থি বস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা দরিদ্র দেশে আর কে আছে? আমার সকল ধর্ম্মের সহায় তুমি! সে সহায় যে ত্যাগ করিল, তার কাছে আবার সনাতন ধর্ম্ম কি? আমি কোন্ ধর্ম্মের জন্য দেশে দেশে বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহত্যা করিয়া এই পাপের ভাণ্ডার সংগ্রহ করি? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত, হইবে কিনা জানি না; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।

শান্তি কিছু কাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল, "ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভাল-

থাকিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ—আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রত-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

জীবানন্দ বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত—দান—উপবাস—১২ কাহণ কড়ি।"

শান্তি ঈষৎ হাসিল। বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত কি, তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধে কি তাই?"

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল কথা কেন?"

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, একদিন অবশ্য সে দেখা দেখিব। একদিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন চলিলাম তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি, দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ-গান করিতেছিলেন। এমন সময়ে বিষণ্ণমুখে জ্ঞানানন্দনামা একজন অতি তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অত ভারি কেন?"

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালি-কার কাণ্ডটার জন্য নেড়েরা গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে, আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে, এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছে জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি, তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া-বসনের পরিবর্ত্তে চুড়িদার পায়জামা, মের-জাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। মুখ হইতে ত্রিপুণ্ড্রাদি চন্দনচিহ্ন সকল বিলুপ্ত করিলেন। ভ্রমর-কৃষ্ণ গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা-পাইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগল-জাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশেক দূরে দুইটী অতি অনুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের উপর জঙ্গল উঠিয়াছে। সেই দুইটী পাহাড়ের মধ্যে একটী নিভৃত স্থান ছিল। তথায় অনেকগুলি অশ্ব রক্ষিত হইয়াছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এইখানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটী অশ্ব উন্মোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। সেই পথি-পার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূলে, গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, কাদ-ম্বিনীচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায়, দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি শয়ান দেখিলেন। দেখিলেন,

জীবনলক্ষণ কিছু নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইলেন। জীবানন্দের ন্যায়, ভবানন্দও মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে দেখেন নাই। জীবানন্দ যে সকল কারণে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এ মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যা হইতে পারে—ভবানন্দের কাছে সে সকল কারণ অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে বন্দীভাবে নীত হইতে দেখেন নাই—কন্যাটীও সেখানে নাই। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন, কোন্ স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিলেন, বসিয়া কপোলে করলগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে, হাত দিয়া দেখিলেন; অনেক প্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিলেন। তখন মনে মনে বলিলেন, এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব? এইরূপ ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া, রস করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ-দন্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, নিশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ হইল যেন যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অঙ্গুলিতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন; ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে পূর্ব্বদিকের প্রথম-প্রভাতরাগ-বিকাশের ন্যায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়, প্রথম প্রেমানুভবের ন্যায় কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তান-সম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছে। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দম্ভ, অধরে প্রতিজ্ঞা। প্রথমে শত, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র। এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারিহস্তে জ্ঞানানন্দ উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন— "আমরা অনেকদিন হইতে মনে করিয়াছি যে, এই বাবুয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূকরের খোয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু, পরমগুরু, যিনি অনন্তজ্ঞানময়, সর্ব্বদা শুদ্ধাচার যিনি লোকহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার-জন্য শরীরপতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই?" হস্ত প্রসারিত করিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন, "এ বাহুতে কি বল নাই?" বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই, ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে!—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন —যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জ্জয় অসুরগণের নিধনসাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভুও ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয় হইবে। চল, আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলি, গুঁড়ি করি। সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুয়ের বাসা

ভাঙ্গিয়া, খড়-কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বল—হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে!" সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলক সহিত উর্দ্ধে উত্থিত হইল। সহস্র বাহুর আস্ফোটে বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। সহস্র ঢোল যোদ্ধৃবর্গের কর্কশ পৃষ্ঠে তড়্ তড়্ শব্দ হইতে লাগিল। মহাকোলাহলে পশু সকল ভীত হইয়া কানন হইতে পলাইল। পক্ষি সকল ভয়ে উচ্চরব করিয়া গগনে উঠিয়া গগন আচ্ছন্ন করিল। সেই সময়ে শত শত জয়ঢক্কা একেবারে নিনাদিত হইল। তখন 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে!' বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে, তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল। বস্ত্রের মর্ম্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা-শব্দ, কণ্ঠের অস্ফুট নিনাদ, মধ্যে মধ্যে তুমুলরবে হরিবোল। ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তান-বাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগর রক্ষকেরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল এবং সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তখন অতিশয় হরিবোলের গোলযোগ পড়িয়া গেল। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই, তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল, আগুন ধরাইয়া দিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "ফিরিয়া চল, অনর্থক অনিষ্ট-সাধনে প্রয়োজন নাই।" সন্তানদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া, দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের দমনার্থ একদল "পরগণা সিপাহী" পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমন নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা তাহাদের আগমন

সংবাদ পাইয়া আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লাঠি-সড়কি বা বিশ পঁচিশটা বন্দুক, কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে, মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে একটী প্রধান। তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গৃহে অন্য স্ত্রীলোক কেহ ছিল না।

কাজেই শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত। টোলে কতকগুলি ছাত্র বাস করিত; শান্তি অন্য সময়ে তাহাদিগের কাছে বসিয়া খেলা করিত, তাহাদিগের কোলে পিঠে চড়িত; তাহারাও শান্তিকে আদর করিত।

এইরূপে শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্য্যের প্রথম ফল এই হইল, যে শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না অথবা শিখিয়া পরিত্যাগ করিল। ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কখন মেয়ে কাপড় পরাইয়া দিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরিত। টোলের ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না, অতএব শান্তিও কখন খোঁপা বাঁধিত না—কে বা তার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? টোলের ছাত্রেরা কাঠের চিরুণী দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিত, চুলগুলা কুণ্ডলী করিয়া শান্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে ও গালের উপর দুলিত। ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত; শান্তিও ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত। যজ্ঞোপবিত গলায় দিতে পাইত না বলিয়া শান্তি বড় কাঁদিত। কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিকের সময়ে ছাত্রদিগের কাছে বসিয়া তাহাদের অনুকরণ

করিতে ছাড়িত না। ছাত্রেরা অধ্যাপকের অবর্ত্তমানে অশ্লীল সংস্কৃতের দুই চারিটা বুক্‌নি দিয়া, দুই একটা আদিরসাশ্রিত গল্প করিতেন, টিয়া পাখীর মত, শান্তি সেগুলিও শিখিল—টিয়া পাখীর মত, তাহার অর্থ কি, তাহা কিছুই জানিত না।

দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। ব্যাকরণের এক বর্ণ জানে না, কিন্তু ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া শান্তির পিতা "যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবিষ্যতি" বলিয়া শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্য পড়াইলেন। তার পর সব গোলমাল হইয়া গেল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

তখন শান্তি নিরাশ্রয়। টোল উঠিয়া গেল; ছাত্রেরা চলিয়া গেল। কিন্তু শান্তিকে তাহারা ভালবাসিত—শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। একজন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। ইনিই পশ্চাৎ সন্তান-সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব।

তখন জীবানন্দের পিতা মাতা বর্ত্তমান। তাঁহাদিগের নিকট জীবানন্দ কন্যাটীর সবিশেষ পরিচয় দিলেন। পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এ পরের মেয়ের দায় ভার নেয় কে?" জীবানন্দ বলিল, "আমি আনিয়াছি—আমিই দায় ভার গ্রহণ করিব।" পিতা মাতা বলিলেন "ভালই!" জীবানন্দ অনূঢ়—শান্তির বিবাহ বয়স উপস্থিত। অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, 'কাজটা ভাল হয় নাই।' শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত। জীবানন্দের বাড়ীর নিকটেই জঙ্গল, শান্তি জঙ্গলের ভিতর একা প্রবেশ

করিয়া কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায় দুর্লভ ফুল-ফল, এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পরে প্রহার করিয়া, শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল। পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল। একদিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকেও না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্ছা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা জুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে একদল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধ-বিশারদ এবং অন্যান্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়-ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।

শান্তি বালক-সন্ন্যাসীবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায় মধ্যে মিশিল। তাহারা প্রথমে তাহার কোমলাঙ্গ দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু শান্তির বুদ্ধির প্রাখর্য্য, চতুরতা এবং কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আদর করিয়া দলে লইল। শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিল, অনেক লড়াই দেখিল এবং অনেক কাজ শিখিল।

ক্রমশঃ তাহার যৌবনকাল দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোন কথা কহিল না।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিল। শান্তি সংস্কৃতে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসী তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন। সচরাচর সন্ন্যাসীরা জিতেন্দ্রিয়

বলিয়াছি, কিন্তু সকলে নহে। এই পণ্ডিতও নহেন। অথবা ইনি শান্তির অভিনব যৌবনবিকাশজনিত লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় কর্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। শিষ্যাকে আদি-রসাশ্রিত কাব্য সকল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, আদিরসাশ্রিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। তাহাতে শান্তির কিছু অপকার না হইয়া কিছু উপকার হইল। লজ্জা কাহাকে বলে, শান্তি তাহা শিখে নাই, এখন স্ত্রীস্বভাব-সুলভ লজ্জা আসিয়া আপনই উপস্থিত হইল! পৌরুষচরিত্রের উপর নির্ম্মল স্ত্রী-চরিত্রের অপূর্ব্ব প্রভা আসিয়া পড়িয়া, শান্তির গুণগ্রাম উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। শান্তি পড়া ছাড়িয়া দিল।

ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শান্তির অধ্যাপক শান্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগি-লেন। কিন্তু শান্তি ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষেরও দুর্লভ বলসঞ্চয় করিয়াছিল, অধ্যাপক নিকটে আসিলেই তাঁহাকে কিল-ঘুষার দ্বারা পূজিত করিত—কিল ঘুষাগুলি সহজ নহে। একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্তিকে নির্জ্জনে পাইয়া বড় জোর করিয়া শান্তির হাত-খানা ধরিলেন, শান্তি ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ ক্রমে হাতখানা শান্তির বাঁ হাত; দাহিন হাতে শান্তি তাঁহার কপালে এমন জোরে ঘুষা মারিল যে, সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! শান্তি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্য ফলের দ্বারা উদর-পোষণ করিতে করিতে এবং অনেক মারামারীতে জয়ী হইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্ত্তী হইলেন! পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আমার গৃহ-ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এত দিন কোথায় ছিলে?" শান্তি সকল

সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্য মিথ্যা চিনিতে পারিতেন। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অপ্সরাগণের ভ্রুবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতিঃ লইয়া অতি যত্নে নির্ম্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতীর প্রতি অপব্যয় করেন না। ইংরেজ পূর্ণিমার রাত্রে রাজপথে গ্যাস জ্বালে, বাঙ্গালী তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাক, চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেবের পরেও কখন কখন আকাশে উদিত থাকেন, ইন্দ্র সাগরে বৃষ্টি করেন; যে সিন্দুকে টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিন্দুকেই টাকা লইয়া যান; যম যার প্রায় সবগুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তারই বাকিটিকে লইয়া যান। কেবল রতিপতির এমন নির্ব্বুদ্ধির কাজ দেখা যায় না। যেখানে গাটছড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন, তাহার সন্ধানে যান। কিন্তু আজ বোধ হয় পুষ্পধন্বার কোন কাজ ছিল না—হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিষ। নবমেঘনির্ম্মুক্ত প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া ঈষৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।

জীবানন্দ বলিল, "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক।"

শান্তি বলিল, "তুমি ফিরিয়া আসিবে ত?" জীবানন্দ কিছু উত্তর না করিয়া, কোন দিক্ না চাহিয়া সেই পথিপার্শ্বস্থ নারিকেল-কুঞ্জের ছায়ায় শান্তির অধরে অধর দিয়া সুধাপান করিলাম মনে করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

মাকে বুঝাইয়া, জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন। ভৈরবীপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমায়ের বিবাহ হইয়াছিল। ভগিনীপতির সঙ্গে জীবানন্দের একটু সম্প্রীতি হইয়াছিল। জীবা

নন্দ শান্তিকে লইয়া সেইখানে গেলেন। ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল। জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামী সহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রমণীয় রমণী চরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল। সুখস্বপ্নের মত তাঁহাদের জীবন নির্ব্বাহিত হইত; কিন্তু সহসা সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক, শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কৌশলে ঘটিল। তাহাই আমি পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত করিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবানন্দ চলিয়া গেল পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বসিল। শান্তির চোকে আর জল নাই, শান্তি চোক মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল, "তবু ত দেখা হলো।"

শান্তি কিছু উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল, শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভালবাসে না, তাহা নিমাই জানিত সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল; "বলিল, "দেখ দেখি, বউ, কেমন মেয়েটী!"

শান্তি বলিল, "মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো?"

নিমা। মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে।

নিমাই শান্তিকে জালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। "দাদার মেয়ে" অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটী পাইয়াছি। শান্তি

তাহা বুঝিল না ; মনে করিল, নিমাই বুঝি স্থচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল, "আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

নিমাই উচিত শাস্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে-মুড়িয়ে এনেছে তা জিজ্ঞাসা কর্‌বার তো অবসর হলো না। তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে ; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল, তা পরের মেয়ে ছেলে কে আবার নেয় ?" (আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল) "মেয়েটী দিব্য সুন্দর, নাদুস্-নুদুস্ চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।"

তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর নিজের জন্য যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল। তার পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিল, "এতদিন যাহা মনে করিয়াছিলাম, আজি তাহা করিব। যে আশায় এতদিন করি নাই, তাহা সফল হইয়াছে। সফল কি নিষ্ফল—নিষ্ফল। এ জীবনই নিষ্ফল ! যাহা সংকল্প করিয়াছি, তাহা করিব। একেবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শতবারেও তাই।"

এই ভাবিয়া শান্তি ভাতগুলি উননে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্ত্তে তাহাই ভোজন করিল। তার পর তাহার যে ঢাকাই শাড়ীর উপর নিমাইমণির চোট, তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, গেরিমাটীতে তাহা বেশ করিয়া রঙ্গ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে, শুকাইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অতি চমৎকার ব্যাপারে শান্তি

ব্যাপৃত হইল। মাথায় রুক্ষ আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষ কেশ অপূর্ব্ব বিন্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তার পর সেই গৈরিক বসনখানি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া, ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। ঘরে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল, বহুকালের পর শান্তি সেখানি বাহির করিল; বাহির করিয়া দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। দেখিয়া বলিল, "হায়, কি করিয়া কি করি।" তখন দর্পণ ফেলিয়া দিয়া, যে চুলগুলি কাটা পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া শ্মশ্রু-গুম্ফ রচিত করিল। কিন্তু পরিতে পারিল না। ভাবিল "ছি! ছি ছি, তাও কি হয়। সে দিন কাল কি আছে! তবে বুড়ো বেটাকে জব্দ করিবার জন্য, এ তুলিয়া রাখা ভাল।" এই ভাবিয়া শান্তি সেগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম্ম বাহির করিয়া কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনদেবীগণ সেই নিশীথে কাননমধ্যে, অপূর্ব্ব গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিল।

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল আড়া।

"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে!"
সমরে চলিনু আমি, হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে।"

২

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না।"
ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।

নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক'রে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন আনন্দমঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তাননায়ক তিন জন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলাম?"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয় আছে। সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি এতদিন আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী পুনর্ব্বার দয়া করিবেন। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য সে ব্রত আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। বিমুখ হইলে আমরা অনন্ত নরক ভোগ করিব; আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই যে আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি বন্দুক কামানের কাছে লাঠি সোটা বল্লমে কি হইবে? অতএব আমাদিগের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমা- দিগেরও ঐরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।"

জীব। 'সে অতি কঠিন ব্যাপার!

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কি প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব আজ্ঞা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি আজ তীর্থ যাত্রা করিব। যত দিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিও না। কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইও এবং মাতৃ রণজয়ের জন্য অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিও। এই ভার তোমাদিগের দুইজনের উপর রহিল।

ভবানন্দ বলিলেন, "তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কি প্রকারে? গোলাগুলি বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে। আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবে বা কে, আনিবে বা কে?"

সত্য। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কি? এই আনন্দমঠে?

সত্য। তাও কি হয়? ইহার উপায় আমি বহু দিন হইতে চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর অদ্য তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান প্রতিকূল। আমি দেখিতেছি তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে? সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কি? সেখানে কি প্রকারে হইবে?

সত্য। নহিলে কি জন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ মহাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই। তাহার স্ত্রী-কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটী কন্যা নদীতিরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়াছিল। সে ত মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্য। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী—কল্যাণী। কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিলেন, "মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে?"

সত্য। বিষপান করিয়া। জীব। কেন বিষ খাইল?

সত্য। ভগবান তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন।

ভব। সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই হইয়াছিল?

সত্য। মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপই শুনিলাম। এক্ষণে সায়াহ্ন-কাল উপস্থিত আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম। তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভব। সন্তানদিগকে? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে কি?

সত্য। হাঁ, আর একটী নূতন লোক। পূর্ব্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। আজি নূতন আমার কাছে আসিয়াছে। সে অতি তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষ। আমি তাহার আকারেঙ্গিতে ও কথা বার্ত্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি। খাঁটী সোণা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে। তাহাকে সন্তানের কার্য্য শিক্ষা করাইবার ভার জীবানন্দের উপর রহিল। কেন না জীবানন্দ লোকের চিত্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ। আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটী উপ-দেশ বাকি আছে। অতিশয় মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর।

তখন উভয়ে যুক্ত-কর হইয়া নিবেদন করিলেন, 'আজ্ঞা করুন।'

সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দুইজনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না। আমি আসিলে প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন।

ভবানন্দ বলিলেন, "তোমার উপর নাকি ?"

জীব। বোধ হয়। ভগিনীর বাড়িতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম।

ভব। তাতে দোষ কি, সেটা ত নিসিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি ?

জীব। বোধ হয়, গুরুদেব তাই মনে করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, "তোমার কন্যা জীবিত আছে !"

মহে। কোথায় মহারাজ ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন ?

মহে। সকলেই বলে, তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয়। আমার কন্যা কোথায় মহারাজ ?

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে ?

মহে। তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায়, শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ ?

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যত দিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, তত দিন তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে ? দেখিতে ত পাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন, প্রভু ?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়ারজ্জুতে যাহার

চিত্ত বদ্ধ থাকে, লুকে বাঁধা ঘুঁড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রী-পুত্রের মুখদর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র-কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব!

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তানমাত্রেই কি এইরূপ পুত্র-কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে! তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প।

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুঠের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের জন্য লাঠি সড়কী ওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যে অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি! দীক্ষিত হইতে হইবে কেন! আমি ত ইতিপূর্ব্বেই মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন? সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন! বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম-ধর্ম্ম।

সত্য। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ

প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্ট-দেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে?

মহে। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি! কাশিমবাজারে একটা পাদরীর সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—সে ঐ রকম কথা সকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়—তোমরা যীশুকে প্রেম কর—এ যে সেই রকম কথা।

সত্য। যে রকম কথা আমাদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছেন, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ?

মহে। হাঁ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ।

সত্য। ভাল। এই তিনটী গুণের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা। সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি, তাহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা—আমরা তাহা উপাসনা করি। আর তমোগুণ হইতে ভগবান্ শরীরী চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রক্‌চন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়—সর্ব্বসাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিল?

মহে। বুঝিলাম। সন্তানেরা তবে উপাসকসম্প্রদায় মাত্র?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজমূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন অপূর্ব্ব শোভা। রজত, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত বহুবিধ প্রদীপে মন্দির আলোকিত হইয়াছে। রাশি রাশি পুষ্প স্তূপাকারে শোভা করিয়া মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর একজন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, "আমাকে দয়া করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত এবং অনশন আছ ত?"

উত্তর। আছি।

সত্য। তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তান-ধর্ম্মের নিয়ম-সকল পালন করিবে?"

উভয়ে। করিব।

সত্য। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে? উভ। করিব।

সত্য। মাতা-পিতা ত্যাগ করিবে? উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতা-ভগিনী? উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারাসুত? উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী? উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন—সম্পদ—ভোগ? উভ। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না? যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে? উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?
উভ। করিব।

সত্য। রণে কখন ভঙ্গ দিবে না? উভ। না।
সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?
উভ। জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জাতি। অপরটী কি জাতি?
অপর ব্যক্তি বলিল, "আমি ব্রাহ্মণকুমার।"
সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?
উভ। আমরা সে বিচার করিব না, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।
উভ। তথাস্তু।
সত্য। তোমরা গাও, "বন্দে মাতরম্।"
উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরমধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীক্ষাসমাপনান্তে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মার মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ, ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন; কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই; এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাকিব। আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা সেইখানে একটা গড় প্রস্তুত করি। পরিখা-প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড় ঘাঁটির বাঁধ এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লোহনির্ম্মিত এক ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুক-সকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পি-সকল আনাইতেছি। শিল্পি-সকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এইজন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।"

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন, সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্টকথার পর বলিলেন, "কেমন, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি না?"

শিষ্য বলিল, "কি প্রকারে বলিব? আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয় ত সে ভণ্ডামি, নয় ত আত্ম-প্রতারণা।"

সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল বিবেচনা করিয়াছ, যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সেই অনুষ্ঠান করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে। কেন না, তুমি বয়সে অতি নবীন। বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।"

নূতন সন্তান বলিল, "আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।"

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল? যদি বলিতে কোন বাধা থাকে, তথাপি বলিও। আমার কাছে বলিলে কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না। সন্তান-ধর্ম্মের মর্ম্ম এই—যে, যাহা অবাচ্য, তাহাও গুরুর নিকট বলিতে হয়। বলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কাল কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল। সত্যানন্দ বলিলেন "ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে ত এ বয়সে দেড় হাত

দাড়ি কেন? আর, দাড়ি খাট করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চখের চাহনি, কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এত কাজে হাত দিতাম?

শান্তি পোড়ারমুখী, তখন দুই চোক ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "প্রভু দোষই বা কি করিয়াছি? স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?"

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, এক ইস্পাতের ধনুক, আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে, "এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।"

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

সত্য। না, ইহা দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই?

সত্য। চারি জন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। এক জন আমি।

শান্তি। আর? সত্য। জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কি; তুমি দেবী না মানবী?"

শান্তি করযোড়ে বলিল, "আমি সামান্যা মানবী। কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী"

সত্য। তাই বা কিসে? তুমি কি বাল-বিধবা? না বাল-বিধবারও এত বল হয় না, কেন না তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা। সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট?

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রকাশিত করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে, জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতকগুলা হাতীর শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, "কেন, এ পাপাচার করিতে আসিলে?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নতমুখে বলিল, "পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।"

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা—পত্নী গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী—বীরধর্ম্মে রমণী কি?"

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া বীর হইয়াছেন? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন? অর্জ্জুনের কতগুলি বিবাহ গণনা করুন দেখি? ভীমের যত বল, ততগুলি পত্নী। কত বলিব? আপনাকে বলিতেই বা কেন হইবে?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে কোন বীর জায়া লইয়া আইসে?

শান্তি। অর্জ্জুন যখন যাদবীসেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?

সত্য। তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্য্যে বিরত করে। এইজন্য সন্তানের ব্রতই এই যে,

রমণী-জাতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামিদর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামী যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন হইব না? তাই আসিয়াছি।

সত্য। ভাল, তোমায় দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি।

শান্তি বলিলেন, আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?

সত্য। আজ আর কোথা যাইবে? শান্তি। তার পর?

সত্য। মা ভবানীর মত তোমারও ললাটে আগুণ আছে, সন্তানসম্প্রদায় কেন দাহ করিবে? এই বলিয়া পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

শান্তি মনে মনে বলিল, "র বেটা বুড়ো! আমার কপালে আগুণ! আমি পোড়াকপালি না, তোর মা পোড়াকপালি?"

বস্তুত সত্যানন্দের সে অভিপ্রায় নহে—চক্ষের বিদ্যুতের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তা কি বুড়ো বয়সে ছেলে মানুষকে বলা যায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবর্দ্ধন নামে একজন পরিচারক—সেও ক্ষুদ্রদরের সন্তান—প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবর্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল। শান্তি বলিল, "ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এ তো দেখা হইল না?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ও সব খুব ভাল ঘর বটে, কিন্তু ও সকলে লোক আছে।"

শান্তি। কারা আছে? গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি। বড় বড় সেনাপতি কে?

গোব। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দ-মঠ আনন্দময়।

শান্তি। ঘরগুলো দেখি চল না?

গোবর্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পড়িতেছিলেন। অভিমন্যু কি প্রকারে সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই মন নিবিষ্ট—তিনি কথা কহিলেন না। শান্তি সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

শান্তি পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। ভবানন্দ তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুগন্ধি অলকারাশি আকর্ণপ্রসারী ভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে আনন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল কালছায়ায় গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তার পর যেমন করিয়া, শরন্মেঘ বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রাভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃতি মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল। আহা কি শোভা! ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল, সেও কথা কহিল না। কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল, শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টি করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কার ঘর?"

গোবৰ্দ্ধন বলিল, "জীবানন্দ ঠাকুরের।"

শান্তি। সে আবার কে? কৈ কেউ তো এখানে নেই?

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।

শান্তি। এই ঘরটী সকলের ভাল।

গোব। তা এ ঘরটা ত হবে না।

শান্তি। কেন? গোব। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয় আর একটা ঘর খুঁজে নিন্।

গোব। তা কি হয়? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্ত্তা বল্লেই হয়, যা করেন, তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবৰ্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্ব্বক, প্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, জীবানন্দের একখানি পুঁথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবামাত্র জীবানন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; বলিলেন, "এ কি এ? শান্তি?"

শান্তি ধীরে ধীরে পুথিখানি রাখিয়া জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "শান্তি কে মহাশয়?"

জীবানন্দ অবাক—শেষ বলিলেন, "শান্তি কে মহাশয়? কেন, তুমি শান্তি নও?"

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিল, "আমি নবীনানন্দ গোস্বামী।" এই কথা বলিয়া সে আবার পুথি পড়িতে মন দিল।

জীবানন্দ উচ্চ হাস্য করিলেন; বলিলেন, "এ নূতন রঙ্গ বটে। তার পর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে ক'রে এসেছ?"

শান্তি বলিল, "ভদ্রলোকের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, প্রথম আলাপে 'আপনি' 'মহাশয়' ইত্যাদি সম্বোধন করিতে হয়। আমিও আপনাকে অসম্মান করিয়া কথা কহিতেছি না,—তবে আপনি কেন আমাকে 'তুমি তুমি' করিতেছেন?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া যোড় হাত করিয়া বলিল, "এক্ষণে বিনীতভাবে ভৃত্যের নিবেদন, কি জন্য ভরুইপুর হইতে এ দীনভবনে মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন।"

শান্তি অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "ব্যঙ্গেরও প্রয়োজন দেখিতেছি না। ভরুইপুর আমি চিনি না। আমি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়া, আজ দীক্ষিত হইয়াছি।"

জী। আ সর্ব্বনাশ! সত্য না কি?

শা। সর্ব্বনাশ কেন? আপনিও দীক্ষিত।

জী। তুমি যে স্ত্রীলোক!

শা। সে কি? এমন কথা কোথা পাইলেন?

জী। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতীয়।

শা। ব্রাহ্মণী? আছে না কি? জী। ছিল ত জানি।

শা। আপনার বিশ্বাস যে, আমি আপনার ব্রাহ্মণী?

জীবানন্দ আবার যোড় হাত করিয়া গলায় কাপড় দিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ মহাশয়!"

শা। যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে আপনার কর্ত্তব্য কি বলুন দেখি?

জী। আপনার পাত্রাবরণখানি বলপূর্ব্বক গ্রহণানন্তর অধর-সুধা পান।

শা। এ আপনার দুষ্টবুদ্ধি অথবা গঞ্জিকার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয় মাত্র। আপনি দীক্ষাকালে শপথ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবেন না। যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—এমন সর্পে রজ্জুভ্রম অনেকেরই হয়—তবে আপনার উচিত যে, পৃথক্ আসনে উপবেশন করেন। আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্ত্তব্য।

এই বলিয়া শান্তি পুনরপি পুস্তকে মন দিল। পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বর-কৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে,—কত কোটি তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিলনা। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ি পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বরভূমিখণ্ড সকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পূরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংস লোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্তাঙ্কিতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকেরা বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন-পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশু-সকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্যহস্তী সকল মদমত্ত হইয়া, বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্প-সকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ

করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই ; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই, চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না—জমিদারের খাজানা দিতে পারে না ; জমিদারেরা রাজার খাজানা দিতে পারে না। রাজা জমিদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমিদার-সম্প্রদায় সর্ব্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

এ দিকে সন্তান-সম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসী-দলে বিষ্ণু-পাদ-পদ্ম পূজা করে ; যার ঘরে বন্দুক-পিস্তল আছে, কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, "ভাই! যদি একদিকে এক-ঘর মণিমাণিক্য-হীরক-প্রবালাদি দেখ আর একদিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণিমাণিক্য-হীরক-প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটী লইয়া আসিবে।"

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল। চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে—"ভাই, বিষ্ণুপূজা করবি?" এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুণ দেয়। মুসলমানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল, সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমান-রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব-স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া দলবদ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া

মারপিট করে, কখন কখন প্রাণ বধ করে; যেখানে সরকারী টাকা পায়, লুঠিয়া লইয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে। স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন সন্তানদিগের শাসনার্থ ভূরি ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ, শস্ত্রযুক্ত এবং মহাদম্ভশালী। তাহাদিগের দর্পের সম্মুখে মুসলমানসৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিতবলে সন্তানেরা তাহাদিগের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোন সন্তানের দলকে যবনসৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর এক দল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। এই সময়ে প্রথিতনামা ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শিকলে আমি সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব; একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহ বলিয়াছিলেন—তথাস্তু। কিন্তু সে দিন এখন দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন হেষ্টিংসও বিকম্পিত হইলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহনিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখেও হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া একদল কোম্পানীর সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস পৌঁছিয়া বিদ্রোহ-নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমিদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া কোম্পানীর সুশিক্ষিত সদস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেশী বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া সে সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত যোদ্ধৃ-

বর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন—তুমি অমুক প্রদেশে জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে, পিপীলিকার মত তাহার প্রাণসংহার করিবে। কোম্পানীর সৈনিকেরা কেহ গাঁজা কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্ত্তিত হইতে লাগিল! হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন কোম্পানীর অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিব- গ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফ্যাক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠিসকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই জন্য কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ংও সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন; সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস্ সাহেব দুই চারিদল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতকগুলা চোয়াড়, হাড়ি, ডোম বাগ্দী, বুনো, সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া, পরদ্রব্যাপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ী গাড়ী বোঝাই হইয়া, উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল, যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম-বাগ্দীর দল লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটা গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস্ তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীগণের মধ্যে ২১৫৩ জন

য়িয়াছে, আর ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে। ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য। কাপ্তেন টমাস্, দ্বিতীয় ক্লেনহিম বা অসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁপ-দাড়ি চুমরাইয়া নির্ভয় ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন এবং ডনিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে আর কি, এক্ষণে বিদ্রোহ-নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রী-পুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডনিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, "তা হইবে, আপনি দশদিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক্ স্ত্রী-পুত্র লইয়া আসিব।" ডনিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মটন মুরগী ছিল। পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্য পক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত। শশ্রুমান বাবুর্চ্চিটী দ্বিতীয় দ্রৌপদী, সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস্ সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভবানন্দ মনে মনে গর গর করিতেছে, ভাবিতেছে, কবে এই কাপ্তেন টমাস্ সাহেব বাহাদুরের মাথাটা কাটিয়া, দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে। ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই; কি প্রকারে বুঝিবে? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজেরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই এ কথা ছিল। ভবানন্দ ভাবিতেছিলেন যে এ অসুরের বংশ একদিনে নিপাত করিব, সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাৎ থাকি। সুতরাং তাহারা একটু তফাৎ রহিল। কাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কণ্টক হইয়া দ্রৌপদীর গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন।

সাহেব বাহাদুর শিকার বড় ভালবাসেন, মধ্যে মধ্যে শিবগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। একদিন ডনিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস্ শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি টমাস্ সাহেব অসমসাহসিক, বলবীর্য্যে ইংরেজজাতির মধ্যেও অতুল্য। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহুদূর

আসিয়া শিকারীরা আর যইতে অস্বীকৃত হইল ; বলিল, ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস্ বলিলেন, "তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।" এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুতঃ অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশকরিলেন প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন ? এক বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত-কুসুমযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে ? এ নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস্ সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশীভাষা বিলক্ষণ জানিতেন ; বলিলেন, "টুমি কে ?"

সন্ন্যাসী বলিল, "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন বলিলেন, "টুমি ! সন্ন্যাসী। সে কি ?

কাপ্তেন। হামি টোমায় গুলি করিয়া মারিব।

সন্ন্যাসী। মর।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণচর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। একটানে জটা খুলিয়া ফেলিল। কাপ্তেন টমস্ সাহেব দেখিলেন, অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, সাহেব, আমি স্ত্রীলোক কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোছলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন ? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।"

সাহেব। টুমি কে?

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী। যাহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ, তাঁহাদের কাহারও স্ত্রী।

সাহেব। টুমি হামারা গোড়ে * ঠকিবি?

শান্তি। কি? তোমার উপপত্নীস্বরূপ?

সাহেব। ইষ্ট্রীর মট ঠাকিটে পাড়, লেকেন সাদি হইব না।

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে; আমাদের একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো তুমি সেই কোটরে থাকবে? আমাদের বাগানে বেশ মর্ত্তমান কলা হয়।

সাহেব। টুমি বড় Spirited woman আছে, টোমাড় courage এ হামি খুঁসি আছে। টুমি হামার গোড়ে চল। টোমার স্বামী যুড্ডে মরিয়া যাইব। টখন টোমাড় কি হইব?

শান্তি। তবে তোমায় আমায় একটা কথা থাক, যুদ্ধ ত দুদিন চারিদিনে হইবেই। যদি তুমি জেত, তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর আমরা যদি জিতি, তবে তুমি আসিয়া, আমাদের কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে ত?

সাহেব। কলা খ ইটে উট্টম জিনিস। এখন আছে?

শান্তি। নে তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয়!

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন—স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে।

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে। হরে মুরারে।*

আবার কোথায় স রঙ্গের মধুর নিক্কণে বাজিল তাই ;—

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে। হরে মুরারে।

তাহার সঙ্গে পুরুষকণ্ঠ মিলিয়া গীত হইল—

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে। হরে মুরারে।

তিন স্বরে এক হইয়া গানে বনের লতাসকল কাঁপাইয়া তুলিল। শান্তি গাইতে গাইতে চলিল,—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে। হরে মুরারে ;
জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাস্‌ল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে। হরে মুরারে।
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটিছে রাখিবে কে ?
হরে মুরারে। হরে মুরারে।

সারঙ্গেও ঐ বাজিতেছিল,

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটিছে রাখিবে কে ?
হরে মুরারে। হরে মুরারে।

যেখানে অতি নিবিড় বন, ভিতরে কি আছে, বাহির হইতে একেবারে অদৃশ্য, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখানে সেই শাখাপল্লব-রাশির মধ্যে লুক্কায়িত একটী ক্ষুদ্র কুটীর আছে। ডালের বাঁধন পাতার ছাওয়া, কাটের মেজে, তার উপর মাটী ঢালা। তাহারই ভিতরে লতাদ্বার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি ?"

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল, "নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে ?"

জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"দেখ শান্তি! একদিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণত উৎসর্গই হইয়াছে। যে

পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এত দিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন—”

শান্তি আর বলিতে না দিয়া বলিল, ‘আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মে সহায়।—তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুইজন একত্র সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালের দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?

জীবানন্দ আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বলিলেন, “শিখাইলে ত!” শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, “আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে? বল “বন্দে মাতরম্।” তখন দুই জনে গলা মিলাইয়া “বন্দে মাতরম্” গায়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী; সূর্য্য-

দেব মধ্যাহ্ন এক একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার। গলির পাশের একটী দোতালা বাড়ীতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে একটী ঘরে যেখানে অর্দ্ধবয়স্কা একটী স্ত্রীলোক পাক করিতেছিল, সেইখানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু দর্শন দিলেন। স্ত্রীলোকটী অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা সোটা, কালো কোলো, ঠোঁট পুরু কপালে উল্কি, সীমন্ত প্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে, ঠন্ ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর্ ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্ গল্ করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ায় নানাপ্রকার টলুনি টলুনির বিকাশ হইতেছে। এমন সময় ভবানন্দ মহাপ্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন :—"ঠাকুরুণদিদি, প্রাতঃপ্রণাম!"

ঠাকুরুণদিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না, কেন না, সকড়ি হাত। নিষেকমসৃণ সেই চিকুরজাল—হায়! তাহাতে পূজার সময় একটী বকফুল পড়িয়াছিল! বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল, তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না, কেন না, ঠাকুরুণটী একখানি পাঁচহাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভার প্রান্ত উদরপ্রদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর সুদেহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আবরু পর্দ্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপর উঠিয়া বলিল, আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরমব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে গোঁসাই ঠাকুর? এস এস! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই?"

ভব। তুমি ঠান্‌দিদি যে!

গৌরী। আদর ক'রে বল বলিয়া। তোমরা হলে গোঁসাই মানুষ, দেবতা! তা করেছ করেছ, বেঁচে থাক। তা করিলেও করিতে পার, হাজার হোক আমি বয়সে বড়।

এখন ভবানন্দের অপেক্ষা গৌরী দেবী মহাশয়া বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু সুচতুর ভবানন্দ উত্তর করিলেন, "সে কি ঠানদিদি! রসের মানুষ দেখে ঠানদিদি বলি। নইলে যখন হিসাব হয়েছিল, তুমি আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোট হইয়াছিলে, মনে নাই? আমাদের বৈষ্ণবের সকল রকম আছে জান, আমার মনে মনে ইচ্ছা মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমার সাঙ্গা করে ফেলি। সেই কথাটাই বলতে এসেছি।"

গৌরী। সে কি কথা?—ছি! অমন কথা কি বলতে আছে! আমরা হলেম বিধবা।

ভব। তবে সাঙ্গা হবে না?

গৌরী। তা ভাই, যা জান তা কর। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়েমানুষ কি বুঝি? তা, কবে হবে?

ভবানন্দ অতি কষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া বলিলেন, "সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে একবার দেখা হইলেই হয়। আর—সে কেমন আছে?"

গৌরী বিষণ্ণ হইল। মনে মনে সন্দেহ করিল, সাঙ্গার কথাটা তবে বুঝি তামাসা। বলিল, "আছে আর কেমন, যেমন থাকে।"

ভব। তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস, কেমন আছে; বলিয়া আইস, আমি আসিয়াছি, একবার সাক্ষাৎ করিব।

গৌরী দেবী তখন ভাতের কাটি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া বড় বড় ধাপের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, দোতালার উপর উঠিতে লাগিল। একটা ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া এক অপূর্ব্বসুন্দরী কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কূল-প্লাবিনী প্রসন্নসলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্পভরে নমিতেছে, অট্টালিকাশ্রেণীও শোভি-

তেছে, তরণী-শ্রেণী তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু সেই কাদম্বিনীনিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্ব্বের মত চারুচিক্কণ চঞ্চল নিবিড় অলকদাম, পূর্ব্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্ব্বমত অতুল তুলিকালিখিত ভ্রূধনু, পূর্ব্বের মত বিস্ফারিত সজল উজ্জ্বল কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগরঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় চল চল, বাহু তেমনি বনলতাদুষ্প্রাপ্য কোমলতাযুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সৌন্দর্য্য আর সে মাধুর্য্য। নূতন হইয়াছে ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য। ইহাকে পূর্ব্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যলোকে অতুলনীয়া সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপ-গ্রস্তা দেবী। ইঁহার চারি পার্শ্বে দুই তিনখানা তুলটের পুথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙ্গান আছে, আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পট, কালিয়দমন, নবনারী-কুঞ্জর, বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্র রঞ্জিত আছে। চিত্রগুলির নীচে লেখা আছে "চিত্র না বিচিত্র?" সেই গৃহমধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কল্যাণি, শারীরিক মঙ্গল ত?'

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না? আমার শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট, আর আমরই বা কি ইষ্ট?

ভব। যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে তাহাতে নিত্য জল দেয়। গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ। তোমার মৃতদেহে আমি জীবন রোপণ করিয়াছিলাম, বাড়িতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব না কেন?

ক। বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে? ভব। জীবন কি বিষ?

ক। না হলে অমৃত ঢালিয়া আমি তাহা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলাম কেন?

ভব। যে অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কে তোমার জীবন বিষময় করিয়াছিল ?

কল্যাণী স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "আমার জীবন কেহ বিষময় করে নাই। জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলের জীবন বিষময়।

ভব। সত্য কল্যাণি, আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি—তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে ?

ক। না। ভব। অভিধান ? ক। ভাল লাগে না।

ভব। বিদ্যা অর্জ্জনে কিছু আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। এখন এ অশ্রদ্ধা কেন ?

ক। আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন লেখা-পড়া না করাই ভাল।" আমার স্বামীর সংবাদ কি প্রভু ?

ভব। বার বার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা কর ? তিনি ত তোমার পক্ষে মৃত।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন।

ভব। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই ত তুমি মরিলে। বার বার সে কথা কেন কল্যাণি ?

ক। মরিলে কি সম্বন্ধ যায় ? তিনি কেমন আছেন ?

ভব। ভাল আছেন।

ক। কোথায় আছেন ? পদচিহ্নে ?

ভব। সেইখানেই আছেন।

ক। কি কাজ করিতেছেন ?

ভব। যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্ম্মাণ, অস্ত্রনির্ম্মাণ; তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের আমাদের আর অভাব নাই। সন্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগের মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু !

ক। আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত ? যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা, সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে ?

যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?

ভব। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়।

ক। ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক। আমি বিষকণ্টকের দ্বারা তাহার অধর্ম্মকণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ছি! দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী! এ প্রাণ তুমি ফিরিয়া দিলে কেন?

ভব। ভাল, যা দিয়াছি, তা না হয় আমারই আছে। কল্যাণি! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার?

ক। আপনি কিছু সংবাদ রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে?

ভব। অনেক দিন সে সংবাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেক দিন সে দিকে যান নাই।

ক। সে সংবাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম ত কন্যা কেন ত্যাগ করিব? এখনও সুকুমারীকে পাইলে এ জীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আমার জন্য আপনি কেন এত করিবেন?

ভব। করিব কল্যাণি। তোমার কন্যা আনিয়া দিব। কিন্তু তার পর?

ক। তার পর কি ঠাকুর? ভব। স্বামী?

ক। ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভব। যদি তাঁর ব্রত সম্পূর্ণ হয়?

ক। তবে তাঁরই হইব। আমি যে বাঁচিয়া আছি, তিনি কি জানেন?

ভব। না। ক। আপনার সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না?

ভব। হয়। ক। আমার কথা কিছু বলেন না?

ভব। না, যে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কি? ক। কি বলিতেছেন?

ভব। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। ক। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।

ক। তোমার সঙ্গে না কি? ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে না কি? ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তানধর্ম্ম কোথায় থাকিবে? ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল? ভব। অতল জলে।

ক। এই মহাব্রত? ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য সব অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ; সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যে দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না! দাহ! কল্যাণি! দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তানধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য?

ভব। এ কথা সত্য। ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব। ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি? ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না, আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে? ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কন্যা পাঠাইয়া দিবে কি? ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিল, "দিব। আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?"

কল্যাণী বলিল, "রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।

ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুথি পড়িতে বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। পথে একাকী যাইতেছিলেন। বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বনমধ্যে আর একব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে যাও?"

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই—আমি পথিক!" ভব। "বন্দে।"

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "মাতরম্।"

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী। অগ্রগামী। আমি ধীরানন্দ। ভব। ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে?

ধীর। আপনারই সন্ধানে। ভব। কেন?

ধীর। একটা কথা বলিতে। ভব। কি কথা?

ধীর। নির্জ্জনে বক্তব্য।

ভব। এইখানেই বল না, এ অতি নির্জ্জন স্থান।

ধীর। আপনি নগরে গিয়াছিলেন? ভব। হাঁ।

ধীর। গৌরি দেবীর গৃহে? ভব। তুমিও নগরে গিয়াছিলে না কি?

ধীর। সেখানে একটী পরমাসুন্দরী যুবতী বাস করে?

ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন,—"এ সকল কি কথা?"

ধীর। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?

ভব। তার পর? ধীর। আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।

ভব। (কিছু ভাবিয়া) ধীরানন্দ, কেন এত সন্ধান লইলে? দেখ ধীরানন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। তুমি ভিন্ন আর কয়জন এ কথা জানে? ধীর। আর কেহ না।

ভব। তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি? ধীর। পার।

ভব। আইস, তবে এই বিজন স্থানে দুই জনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্ব্বাণ কর। অস্ত্র আছে?

ধীর। আছে—শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ সকল কথা কয়। যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, তবে অবশ্য করিব। সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কাহারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহা বলিবার জন্য আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম, তাহা সবটা শুনিয়া যুদ্ধ করিলে ভাল হয় না? ভব। ক্ষতি কি—বল-না।

ভবানন্দ তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া ধীরানন্দের স্কন্ধে স্থাপিত করিলেন। ধীরানন্দ না পলায়।

ধীর। আমি এই বলিতেছিলাম;—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর— ভব। কল্যাণী, তাও জান?

ধীর। বিবাহ কর না কেন?

ভব। তাহার যে স্বামী আছে?

ধীর। বৈষ্ণবের সেরূপ বিবাহ হয়।

ভব। সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নহে। সন্তানের বিবাহই নাই।

ধীর। সন্তান-ধর্ম্ম কি অপরিহার্য্য—তোমার যে প্রাণ যায়। ছি! ছি! আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল? (বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল।)

ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে আসিয়াছ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে।

ধীর। তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে—তরবারি বসাইও না— বলিতেছি। এই সন্তানধর্ম্মে আমার হাড় জর জর হইয়াছে।

আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্য বড় উতলা হইয়াছি। আমি এ সন্তানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমার কি বাড়ী গিয়া বসিবার যো আছে? বিদ্রোহী বলিয়া আমাকে অনেকে চিনে। ঘরে গিয়া বসিলেই হয় রাজপুরুষে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতী বলিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এই জন্য তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই।

ভব। কেন, আমায় কেন?

ধীর। সেইটী আসল কথা। এই সন্তানেরা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধ জয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী। তুমি রাজা হও—কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্ব্বাদ করি। সন্তানধর্ম্ম অতল জলে ডুবাইয়া দাও।

ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন; বলিলেন, ধীরানন্দ! যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ, নিজেও বিশ্বাসঘাতক; তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।" ধীরানন্দ, কথা শেষ হইতে না হইতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ভবানন্দ তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন না। ভবানন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনা ছিলেন, যখন খুঁজিলেন, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই জঙ্গল মধ্যে এক স্থানে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ

আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর, লতাগুল্মকণ্টকাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটী অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষতলায় দুর্ভেদ্য, বন্যপশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য, নীরব! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী, পশুদিগের দ্রুতগমন-শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগীরথী-জলতরঙ্গ-সমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এক মুহূর্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে,—দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়। ধর্ম্মত্যাগী? ছি! মরিব!" এমন সময়ে পেচক মাথার উপর গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ও কি শব্দ? কানে যেন গেল, যম আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না, কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বাধ দিল, কে মরিতে বলিল! পুণ্যময়ি অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের তো মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় ধর্ম্মে মতি দাও, আমায় পাপ হইতে বিরত কর। ধর্ম্মে—হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে।"

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল; কে বলিল, "ধর্ম্ম তোমার মতি থাকিবে—আশীর্ব্বাদ করিলাম।"

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। "এ কি এ? এ যে গুরু-দেবের কণ্ঠ। মহারাজ! কোথায় আপনি? এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।"

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃপুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এদিক্ ওদিক্ খুঁজিলেন—কোথাও কেহ নাই।

যখন রজনী-প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে প্রতিভাসিত হইতেছিল, তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ণে প্রবেশ করিল—'হরে মুরারে! হরে মুরারে।' চিনিলেন, সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন;—

> "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
> বিহিত-বহিত্র চরিত্রমখেদং,
> কেশব ধৃতমীনশরীর
> জয় জগদীশ হরে।"

গোস্বামীবিরচিত মধুর স্তোত্র যখন শান্তিদেবীকণ্ঠনিঃসৃত হইয়া রাগ-তাল-লয়-সম্পূর্ণ হইয়া সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসের সময়ে বসন্তানিল-তাড়িত তরঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় মধুর হইয়া আসিল, তখন তিনি গায়িলেন;—

> "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং।
> সদয় হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতং,
> কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
> জয় জগদীশ হরে।"

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীরস্বরে গায়িল, গম্ভীর-মেঘগর্জ্জনবৎ তানে গায়িল ;—

"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং,
কেশব ধৃতকল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল ; বলিল "প্রভো, আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে। বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি আবার গায়িল,—

তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।

সত্যানন্দ বলিলেন, "মা, তোমার কুশলই হইবে।"

শান্তি। কিসে ঠাকুর তোমার তো আজ্ঞা আছে—আমার বৈধব্য!

সত্য। তোমারে আমি চিনিতাম না। মা! দড়ির জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে, আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘকাদম্বিনীবিরাজিত বিদ্যুত্তুল্য ঘোর রোষকটাক্ষ হইল। শান্তি বলিল, "কি ঠাকুর! আমি আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব। মরিতে হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কি? আমি তো সঙ্গে সঙ্গে মরিব তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি আমার স্বর্গ নাই?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন যে, "আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম। মা আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।"
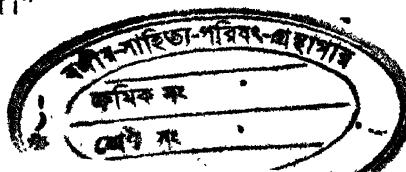
বিজলী হাসিল। শান্তি বলিল, "আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না!"

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব, জীবানন্দ, ভবানন্দ, সবাই মরিবে, বোধ হয় মা তুমিও মরিবে; কিন্তু দেখ কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্য্যে কি মরা ভাল?—আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও মা বলি নাই, কেন না সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। আর তোমাকে মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর, যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয় তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণরক্ষা করিও।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তানসম্প্রদায় নদীতীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জোৎস্না-রাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কানন মধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদিরঞ্জিত মহাগহনে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা কোলাহলধ্বনি করিতে

লাগিল। সত্যানন্দ কি জন্য কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে, তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল, "মহারাজের তপঃসিদ্ধি হইয়াছে—আমাদের রাজ্য হইবে।" তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল।

কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, "মার, মার, নেড়ে মার।" কেহ বলিল, "জয় জয়! মহারাজকি জয়।" কেহ গায়িল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"* কেহ গায়িল, "বন্দে মাতরম্!" কেহ বলে, "ভাই এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব?" কেহ বলে, "ভাই এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?" কেহ বলে, "ভাই এমন দিন কি হইবে, আপনার ধন আপনি খাইব?" দশ সহস্র নরকণ্ঠের কলকল-রব, মধুর বায়ুসন্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মর্ম্মর, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদু মৃদু তর-তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা, শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম। আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্ব্বজনমনোরম "বন্দে মাতরম্!" সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই দশ সহস্র সন্তানমস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদপতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল। অতি উচ্চৈঃস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে উভয় বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশিমথন, মধুমুরনরকমর্দ্দন, লোকপালন, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্ম্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর।" তখন সেই সহস্র কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে লাগিল,—

"জয় জগদীশ হরে।
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

সত্যানন্দ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "হে সন্তানগণ! তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাসনামা একজন বিধর্ম্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল?"

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। "এখনই মারিব—কোথায় তারা দেখাইয়া দিবে চল!" "মার! মার! শত্রু মার!" ইত্যাদি শব্দ দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "সে জন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা বড় বীরজাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব ঐ দেখ প্রভাত হইতেছে—বেলা চারিদণ্ড হইলেই—ও কি ও—"

"গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্!" অকস্মাৎ চারি দিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস্ সন্তানসম্প্রদায়কে এই আম্রকাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

"গুড়ুম গুড়ুম গুম্" ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, "গুড়ুম গুড়ুম গুম্!" নদীর বাঁধে বাঁধে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইল, "গুড়ুম গুড়ুম গুম্।" নদীপারে দূরস্থ কাননান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল, "গুড়ুম গুড়ুম গুম্! সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, তোমরা দেখ কিসের তোপ। কয়েকজন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাঁহাদের উপর বৃষ্টি

হইল, তাহারা অমনি হত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন, "উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি।" তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন, তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "তোপ ইংরেজের।" সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "অশ্বারোহী না পদাতি ?"

জীব। দুই-ই আছে। সত্য। কত ?

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্য। গোরা আছে ? না কেবল সিপাহী।

জীব। গোরা আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন, "তুমি গাছ হইতে নাম।" জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন।

সত্যানন্দ বলিলেন, "দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে ; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।" জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। একবার নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেঙ্গিতে কি বলিলেন, কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নবীনানন্দ নয়নেঙ্গিতে কি উত্তর করিল, তাহাও কেহ বুঝিল না, কেবল তারা দুইজনেই মনে মনে বুঝিল, যে হয় ত এ জন্মের মত এই বিদায়। তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন, "ভাই এই সময় গাও জয় জগদীশ হরে !" তখন সেই দশসহস্র সন্তান এক কণ্ঠে নদী, কানন, আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল,

"জয় জগদীশ হরে।
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্—"

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তানসম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক ছিন্নবাহু ছিন্নহৃৎপিণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না, সকলে গায়িতে লাগিল, "জয় জগদীশ হরে !"

গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই নিবিড় কানন, সেই নদী-সৈকত, সেই অনন্ত বিজন একেবারে গম্ভীর নীরবতায় নিবিষ্ট হইল; কেবল সেই অতি ভয়ানক কামানের ধ্বনি আর দূরশ্রুত গোরার সমবেত অস্ত্রের ঝঞ্চনা ও পদধ্বনি।

তখন সত্যানন্দ সেই গভীর নিস্তব্ধতা মধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন—তোপ কত দূর?"

উপর হইতে একজন বলিল, "এই কাননের অতি নিকটে একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র।

সত্যানন্দ বলিলেন, "কে তুমি?"

উপর হইতে উত্তর হইল, "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ সহস্র সন্তান, আজ তোমাদের জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।" তখন অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন, "আইস।"

সেই দশ সহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইল। পদাতির স্কন্ধে বন্দুক, কটীতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র, সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। একজন জীবানন্দকে বলিল, "জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি?"

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভবানন্দ—জীবানন্দ উত্তর করিলেন, "কি করিতে বল?"

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করি—তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সন্তানসৈন্য এক দণ্ড টিকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

জীব। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা কাড়িয়া লইতে যাইব।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে? কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও, আমি যাইতেছি।

জীব। তা হবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন।

ভ। আজ আমার মরিবার দিন।

জীব। আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভব। তুমি নিষ্পাপশরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাক, আমি যাই।

জীব। ভবানন্দ! তোমার কি পাপ আমি জানি না। কিন্তু তুমি থাকিলে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমি যাই। ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিলেন, "মরিবার প্রয়োজন হয় আজই মরিব; যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে সেই দিনই মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল?"

জীব। তবে এসো।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তানসৈন্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষে সারি সারি সন্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন, "এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এই সময়ে গাও বন্দে মাতরম্!" তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তানসেনা তোপের তালে গায়িল, "বন্দে মাতরম্!'

দশম পরিচ্ছেদ।

সেই দশ সহস্র সন্তান "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতিদ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড বিখণ্ড বিদীর্ণ উৎপতিত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল তথাপ সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময় কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় একদল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গিন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণ করিল। তখন দুই দিক হইতে

আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ তোমরই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণবধ্বংসের প্রয়োজন নাই; ধীরে ধীরে ফিরি।"

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীব। সম্মুখে ও দক্ষিণপার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বামপার্শ্বে কেহ নাই, চল অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বামদিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে নদী—নূতন বর্ষায় নদী যে অতি প্রবল হইয়াছে! তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তানসেনা নদীর জলে ডুবাইবে?

জীব। নদীর একটা পুল আছে আমার স্মরণ হইতেছে।

ভব। এই দশ সহস্র সেনা সেই পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে, যে বোধ হয় একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদয় সন্তানসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীব। এক কর্ম্ম কর; অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ, এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে—তোমার অসাধ্য কাজ নাই। তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই। তোমার সঙ্গে যাহারা রহিল, তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহারা রহিল তাহারা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুই সহস্র সন্তান লইয়া পুনর্ব্বার "বন্দে মাতরম্" শব্দ উত্থিত করিয়া, ঘোর উৎসাহ-সহকারে ইংরেজের গোলন্দাজ-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেইখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তানসেনা কতক্ষণ টিকে? ধান-কাটার মত তাহাদিগকে গোলন্দাজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া, বামভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। কাপ্তেন টমাসের একজন সহযোগী লেপ্টনাণ্ট ওয়াট্‌সন্ দূর হইতে দেখিলেন, যে এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে; তখন তিনি একদল ফৌজদারী সিপাহী, একদল পরগণা সিপাহী লইয়া, জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস্‌ দেখিতে পাইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা একজন সহযোগীকে বলিলেন যে, "আমি দুই চারি শত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বামদিক্ দিয়া লেপ্টনাণ্ট ওয়াট্‌সন্ যাইতেছেন, দক্ষিণদিক্ দিয়া তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলে তিন দিক্ হইতে উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখীর মত মারিতে পারিব। উহারা দ্রুতপদ দেশী ফৌজ, সর্ব্বাপেক্ষা পলায়নেই সুদক্ষ। অতএব তুমি উহাদিগকে সহজে ধরিতে পারিবে না, তুমি অশ্বারোহীদিগকে একটু ঘুর পথে আড়াল দিয়া গিয়া পুলের মুখে দাঁড়াইতে বল, তাহা হইলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে।" কাপ্তেন হে তাহাই করিল।

"অতি দর্পে হতা লঙ্কা।" কাপ্তেন টমাস্ সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুইশত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন, যে "এই কয়জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা "জয় জগদীশ হরে বল।" তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তান-সেনা "জয় জগদীশ হরে" বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপরি লাফাইয়া পড়িল। সে আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহী ও তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবা-

নন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, "কাপ্তেন সাহেব! তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস—তোমার প্রাণদান দিলাম, আপাততঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক্, আমরা তোমাদের সুহৃদ।" কাপ্তেন টমাস তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গীনসহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিলেন, কাপ্তেন টমাস নড়িতে পারিল না। তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, "ইহাকে বাঁধ।" দুই তিন জন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাস্‌কে বাঁধিল। ভবানন্দ বলিলেন, "ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও, চল উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই।"

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাস্‌কে ঘোড়ায় বাঁধিয়া লইয়া "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে লেপ্টনাণ্ট ওয়াটসনকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননে আশ্রয় লইল। অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন। কিন্তু সেইখানে হে ও ওয়াটসন্ তাহাদিগকে দুই দিক্ হইতে ঘিরিল। আর রক্ষা নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে টমাসের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইল, কেহ বাঁচিবার আর কোন আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পারিল পলাইতে লাগিল। জীবানন্দ ধীরানন্দ তাহাদিগকে সংযত এবং একত্রিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। সেই সময় উচ্চৈঃস্বর হইল, "পুলে যাও, পুলে যাও!

ওপারে যাও। নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজ-সেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।"

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিলেন "জীবানন্দ! পুলে যাও, রক্ষা নাই।" তখন ধীরে ধীরে পিছে হটিতে হটিতে সন্তানসেনা পুলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইল। পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তান-ক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ ধীরানন্দ, এস তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি।" তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্ত্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তখন আর আর সন্তানগণ তাহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, "বল বন্দে মাতরম্!" সকলে গায়িল "বন্দে মাতরম্!" ভবানন্দ বলিলেন, "জীবানন্দ, এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।" সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল! বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুই জনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও, আমি একা ব্যূহমুখ রক্ষা করিব—তোপ চালাইবার জন্য আমার কাছে জন কয় গোলন্দাজ দিয়া যাও।" কুড়িজন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়িজন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন—কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ!—ভবানন্দকে

সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমন্থের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক—কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যবন বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল. কিন্তু কুড়ি জন সন্তান, তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও হটে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না। সে বীরেরা অজেয়, সে জীবন অবিনশ্বর। অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তানসেনা অপর পারে গেল। আর কিছুকাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময় কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—"গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ বুম্।" উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান! দেখিল বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উদগীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপরে অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত যবনসেনা প্রাণভয়ে শিহরিল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই চারি জন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "ভাই, নেড়ে ভাঙ্গিতেছে, চল, একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।" তখন পিপীলিকাস্রোতবৎ সন্তানের দল নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথী তরঙ্গ সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্ব্বতাকার মত্তহস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্তানেরা তেমনি যবনদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যবনেরা দেখিল, পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরাজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা,

সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। বিধর্ম্মীর দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, বিধর্ম্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তোপ সন্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুতর ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল। সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াটসন ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।" জীবানন্দ ভবানন্দের মুখ চাহিলেন। ভবানন্দ মনে মনে বলিলেন, "তা হইবে না, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।" তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন, "মার মার।"

আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ একস্থানে ২০।৩০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই কয়জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণ দান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া যাই।" ভবানন্দ বলিলেন, "একজন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না। জীবানন্দ, তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি যে তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, একা আমি এই কয়জন ইংরেজকে নিহত করি।"

কাপ্তেন টমাস্ অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন, "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে, তবে আমি মরিব।"

কাপ্তেন টমাস্ বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল, "ইংরেজ! আমি তো মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খৃষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার, তার পর এই বিদ্রোহীদিগকে মার।"

ভোঁ করিয়া একটা বুলেট ছুটিল, একজন আইরিস্‌ম্যান্ কাপ্তেন টমাস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস্ প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন, "আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর

মকুল সন্দেহ আছে যে, এ সময় আমায় রক্ষা করিবে! দেখ বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিতেছে। আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি, আমার সঙ্গে মরিতে চাও, এমন সন্তান কেহ আছে?"

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে আর। ১০।১৫।২০।৫০ জন সন্তান আসিল। ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমিও কি আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে?"

ধীর। কেন, মরা কি কাহারও ইজারা মহল না কি? এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ একজন গোরাকে আহত করিলেন।

ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না।

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ? এখনও বুঝ নাই?—(ধীরানন্দ আহত গোরাকে বধ করিলেন।)

ভব। না—(এই সময়ে একজন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।)

ধীর। আমার সাধ্য কি যে, তোমার ন্যায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কি? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস? (ভবানন্দ তখন একহাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন) ধীরানন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে বলিলেন "কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।"

ভব। কি প্রকারে?

ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও। (ভবানন্দ একজন গোরা কর্তৃক আহত হইয়া তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন।) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন এমন সময়ে তুমি আসিলে। সাবধান! (ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।)

ভব। আমার মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিও। বলিও, আমি অবিশ্বাসী নহি।

ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে, যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রের আশীর্ব্বাদ-বাক্য মনে কর। মার আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, "ভবানন্দের কাছে থাকিও। আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে।"

ভবানন্দ বলিলেন, "সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার 'বন্দে মাতরম্' শুনাও দেখি।"

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞানুক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে "বন্দে মাতরম্" গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মুহূর্ত্তে ভবানন্দ মুখে "বন্দে মাতরম্" গায়িতে গায়িতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

এতক্ষণ বৈষ্ণবদিগের রণবাদ্য অধিক ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়ানাগরা, ঢাক-ঢোল, কাঁসি-সানাই, তুরী ভেরী, রামসিঙ্গা-দামামা আসিয়া জুটিল। জয়সূচক বাদ্যে কানন-প্রান্তর নদী সকল শব্দ ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, "জগদীশ আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্ম্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকি আছে। যাহারা আমাদিগের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল যাই, আমরা

গিয়া তাহাদিগের সংকার করি; বিশেষ যে মহাত্মা আমাদিগের জন্য এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল মহান উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি।" তখন সন্তানদল "বন্দে মাতরম্" বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকারে চলিল। বহুলোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা-রচনা করিল এবং তাহাতে ভবানন্দকে শায়িত করিয়া অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া "হরে মুরারে" গায়িতে লাগিল। ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচজনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, "এত দিন যে জন্য আমরা সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশে যবনসেনা আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে, একদণ্ড আমাদিগের নিকট টিকিবে না, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও?"

জীবানন্দ বলিলেন "চলুন, এই সময় গিয়া রাজধানী অধিকার করি।"

সত্য। আমারও সেই মত। ধীরানন্দ। সৈন্য কে থায়?

জীব। কেন, এই সৈন্য।

ধীর। এই সৈন্য কই? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন?

জীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।

ধীর। একজনকেও পাইবেন না।

সত্য। কেন?

ধীর। সবাই লুঠিতে বাহির হইয়াছে। গ্রামসকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুঠিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না। আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, "যাই হউক এ প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে,

আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা সন্তানের নিশান উড়াইবে।"

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।"

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মে যাও।"

তখন চারি জনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সত্যানন্দ তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিনজন চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র রহিলেন। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুই জনেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্ব্বদা ভয় কোন দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহবিসর্জ্জন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞারক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইল; প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যতদিন না সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হয়, ততদিন তুমি স্ত্রী-কন্যার মুখদর্শন করিবে না। এক্ষণে কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।"

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী

হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে, তাতো জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাইব ? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে। ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।”

সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, “ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান বলিয়া দিবেন।” এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন। শান্তি তাহা বুঝিয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন, “কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ?

শান্তি বলিল, “আমার আশ্রমে আসুন।” এই বলিয়া শান্তি আগে আগে চলিল।

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী, একা ভূমে প্রণত হইয়া মাটিতে মস্তক স্থাপন করিয়া, মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। এমন সময় কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, “আমি আসিয়াছি।”

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “আপনি আসিয়াছেন ? কেন ?” যে আসিয়াছিল, সে বলিল, “দিন পূর্ণ হইয়াছে।” ব্রহ্মচারী বলিলেন, “হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘী-পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।”

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণ হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ “বন্দে মাতরম্” কেহ “জগদীশ হরে” বলিয়া গায়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

কেহ রাজসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্য প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে, ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে "বল বন্দে মাতরম্" নহিলে মারিয়া ফেলিব। কেহ ময়রার দোকান লুটিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে, "আমরা ব্রজ-গোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?" সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।" গ্রাম্য-লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু।"

দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। চারিদিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। নগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠে সকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। সমস্ত লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল, "আসুক সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।" মুসল-মানেরা বলিতে লাগিল, "আল্লা আকবর! এত্না রোজের পর কোরাণসরিফ্ বেবাক্ কি ঝুঁটো হলো; মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁদুর দল ফতে করতে নার্-লাম। দুনিয়ার সব ফাঁকি।" এইরূপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাস্য করিয়া, সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

এ সকল কথা কল্যাণীর কাণে গেল—আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিল, "জয়

জগদীশ্বর! আজ তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামীসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হও।"

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া, একা খিড়কির দ্বার খুলিয়া, এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরীদেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিক্রান্ত হইল। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।"

কল্যাণী নগরের ঘাটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালা বলিল, "কে যায়?" কল্যাণী ভীতস্বরে বলিল, "আমি স্ত্রীলোক।" পাহারাওয়ালা বলিল, "যাবার হুকুম নাই।" কথা দফাদারের কাণে গেল। দফাদার বলিল, "বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ।" শুনিয়া পাহারাওয়ালা কল্যাণীকে বলিল, "যাও মায়, যাবার মানা নাই, লেকেন আজ্‌কা রাতমে বড় আফত্‌; কেয়া জানে মায়ি তোমার কি হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে গির্‌বে, কি খানায় পড়িয়া মরিয়ে যাবে, সো তো হাম্ কিছু জানে না, আজ্‌কা রাত মায়ি, তুমি বাহার না যাবে।"

কল্যাণী বলিল, "বাবা আমি ভিখারিণী—আমার এক কড়া কপর্দ্দক নাই, আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "বয়স আছে, মায়ি বয়স আছে, দুনিয়ামে ওহি তো জেওরাত হ্যায়! বল্‌কে হামি ডেকেত হতে পারে।" কল্যাণী দেখিল, বড় বিপদ, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাটি এড়াইয়া চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালা দেখিল, মায়ি রসিকতাটা বুঝিল না, তখন মনের দুঃখে গাঁজায় দম্ মারিয়া ঝিঁঝিট খাম্বাজে সোরির টপ্পা ধরিল। কল্যাণী চলিয়া গেল।

সে রাত্রে পথে দলে দলে পথিক, কেহ মার্ মার্ শব্দ করিতেছে, কেহ পালাও পালাও শব্দ করিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িল। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ। কেবল

লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতে এক দল অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিদ্রোহীর হাতে সে পড়িয়া গেল। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন দস্যু তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। একজন গিয়া তাহার অঞ্চল ধরিল, বলিল, "তবে চাঁদ।" সেই সময়ে আর একজন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে বক্ষ আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস,—কোথায় যাইবে?"

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল; বলিল, "সে কি?—পদচিহ্নে?" এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইল—এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল। আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে সে বলিল, "হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী!"

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"—

আগন্তুক বলিল, "আমি তোমার দাসানুদাস—হে সুন্দরী! আমার প্রতি প্রসন্না হও।"

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন? দেখিতেছি ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম্ম? আমি আজ নিঃসহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি নাথি মারিতাম।"

ব্রহ্মচারী বলিল, "অয়ি স্মিতবদনে! আমি বহুদিবসাবধি তোমার ঐ বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি।" এই বলিয়া ব্রহ্ম-

চারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়া হাসিল, বলিল, "ও পোড়া কপাল! আগে বল্‌তে হয় ভাই যে, আমারও ঐ দশা।" শান্তি বলিল, "ভাই, মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ?"

কল্যাণী বলিল, "তুমি কে, যে সব জান দেখিতেছি।"

শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ! আমি সব জানি! আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাত্ম্য, তুমি আজ পদচিহ্ন যাইতে পারিবে না।"

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ভয় কি? আমরা নয়নবাণে সহস্র শত্রু বধ করি। চল পদচিহ্নে যাই।"

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বলিল, "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইব।"

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্যপথে লইয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রন্ত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষাবৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন—এবং তাহার বর্ত্তমান বাসস্থান ও সর্ব্বস্থানবিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর

অন্ধকার ছায়া মধ্যে, পশু পক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্ব্বে, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রচয়, আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরু-শ্রেণী। দূরে, কোন শিলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুরকল্লোলিনী, সংকীর্ণা নদীর তর তর শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত ঊষামুকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী শান্তিকে বলিল—"আমরা আপনার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটীর সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

শান্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আমি ঘুমাইব। অষ্ট প্রহরের মধ্যে বসি নাই—দুই রাত্রি ঘুমাই নাই—আমি যাই পুরুষ!"

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক ওদিক চাহিল। তার পর একবার তার ঠোঁট নাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর বলিল, "আমি মেয়ে দিব না।"

নিমাই, গোল হাতখানির উল্‌টাপিট চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিল, "তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও তো নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।"

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না [illegible]? আমার কি?" নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া দুম্ করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগি-

লেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "হাঁ মা—কোথায় যাবমা?" নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে আজ সুখে সমবেত মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি নিমাই, নিমায়ের স্বামী, সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শান্তি নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিল। কল্যাণীকে যে রাত্রে আপন কুটীরে আনে, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিল, যে নবীনানন্দ যে স্ত্রীলোক, এ কথা কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন। একদিন কল্যাণী তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল ভৃত্যগণ বারণ করিল, শুনিল না।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন?"

ক। পুরুষ সাজিয়া কত দিন থাকিবে? দেখা হয় না,—কথা কহিতেও পাই না। আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ হইতে হইবে।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শেষে বলিলেন, "তাহাতে অনেক বিঘ্ন কল্যাণী!"

দুইজনে সেই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না। কৌতুহলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন। কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে,

নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কল্যাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাগছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছেন। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন,—অতিশয় রুষ্ট হইলেন।

নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি গোঁসাই! সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?"

নবীনানন্দ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত?" বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না।

ম। তাতে কি?

ন। আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে?

এবারে মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম?"

ন। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত কেন?

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল; তাই আসিয়াছি।

ন। তবে এখন যান্। কল্যাণীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি সরিয়া যান, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্ব্বদা আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি।

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এ সকল কথা অপরাধীর কথাবার্ত্তার মত নহে। কল্যাণীরও ভাব বিচিত্র। সেও ত অবিশ্বাসিনীর মত পালাইল না, ভীতা হইল না, লজ্জিতা নহে—কিছুই না, বরং মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আর কল্যাণী—যে সেই বৃক্ষতলে অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল—সে কি অপরাধিনী হইতে পারে? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অভাগিনী শান্তি, মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণীর প্রতি এক বিলোল

কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল, মহেন্দ্র দেখিলেন, এ যে রমণীকটাক্ষ। সাহসে ভর করিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিলেন—কৃত্রিম দাড়ি-গোঁপ খসিয়া আসিল। সেই সময়ে অবসর পাইয়া কল্যাণী বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিল—বাঘছালও খসিয়া পড়িল। ধরা পড়িয়া শান্তি অবনতমুখী হইয়া রহিল।

মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শা। শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী।

ম। সে ত জুয়াচুরি; তুমি স্ত্রীলোক?

শা। এখন কাজে কাজেই।

ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সর্ব্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সহবাস কর কেন?

শা। সে কথা আপনাকে নাই বলিলাম।

ম। তুমি যে স্ত্রীলোক, জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন?

শা। জানেন।

শুনিয়া, বিশুদ্ধাত্মা মহেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন।

দেখিয়া কল্যাণী আর থাকিতে পারিল না; বলিল, "ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্ম্মপত্নী শান্তিদেবী।"

মুহূর্ত্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, "ইনি ব্রহ্মচারিণী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উত্তর-বাঙ্গালা মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—মনকে চোক ঠারেন—বলেন, কতকগুলা লুঠেড়াতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কতকাল যাইত বলা যায় না; কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মনকে চোক ঠারিবার লোক নহেন—তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত?

অপরিমিত সন্তান শাসনার্থে Major Edwards নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এড্ওয়ার্ডস্ দেখিলেন যে, এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যে দিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই দিনের জন্য সে স্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন—তার পরদিন ব্রিটিশসেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারিদিকে "বন্দে মাতরম্" গীত হইতে লাগিল। সাহেব খুঁজিয়া পান্ না, কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া, যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয়, তাহা দাহ করিয়া যায়; অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সংবাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সংবাদ পাইলেন, তাহাতে তিনি দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণের পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এড-ওয়ার্ডস্ বিবেচনা করিলেন যে, পদচিহ্নের রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর রটনা করিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন। একত্রই সকল বৈষ্ণব পাইয়া এক দিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন। বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। সকল সন্তানই নদীতীরে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর সাহেব যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্য ক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন, মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাঁহাদের তখন মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্য দিনে, শুভক্ষণে, পবিত্র জলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তান দিগের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া, বীরদম্পতী দেখিতে পাইলেন—যে নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজ শিবির। শান্তি বলিল, "মরার কথা এখন থাক্—বল 'বন্দে মাতরম্'!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তখন দুই জনে কানে কানে কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে, ইহা স্থির করিয়াছিল। তাহার এ পুরুষবেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে। জুয়াচুরি করিতে করিতে মরা হইবে না, সুতরাং ঝাঁপি টেঁপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার সজ্জা-সকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া বেশ পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।

চিকন রকম রসকলির উপরে খয়েরের টিপ কাটিয়া তৎকাল-প্রচলিত ফুরফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতকগুলি ঝাপটার গোছায় চাঁদমুখখানি ঢাকিয়া, শান্তি একটী সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে ইংরাজ শিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রুযুক্ত সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কৃষ্ণবিষয়, ফরমাস্ করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ ডাল দিল, কেহ মিষ্ট দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া, চলিয়া যায়, সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?" বৈষ্ণবী বলিল, "তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর।" সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দুর?" বৈষ্ণবী বলিল, 'আমার বাড়ী পদচিহ্নে।" এখন সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। একজন সিপাহী তাহা জানিত। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল। মেজর সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া মর্ম্মভেদী কটাক্ষে সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিল—

"ম্লেচ্ছানবহনিধনে, কলয়সি করবালম্।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমার বাড়ী কোঠা বিবি?"

বিবি বলিল, "আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।"

সাহেব। well that is Padsin—Padsin is it? হুঁয়া একটো গর হ্যায়?"

বৈষ্ণবী বলিল, "ঘর? - কত ঘর আছে।"

সাহেব। গর নেই,—গর নেই,—গর - গর—

শান্তি। সাহেব, তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড়?"

সাহেব। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর!—হ্যায়?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা। সাহেব। কেট্টে আড্‌মি?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নন্সেন্স্। একটো কেল্লেমে ডো চারি হাজার রহে শক্তা। হুঁয়ি পর আবি হ্যায়? ইয়া নিকেল গিয়া?

শান্তি। আবার নেকলাবে কোথা ?

সাহেব। মেলামে—টোম্ কব্ আয়া হ্যায় হুঁয়াসে ?

শান্তি। কাল্ এসেছি সায়েব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল্ গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, "তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে, আমি দেখ্‌বো।" প্রকাশ্যে বলিল, "তা সাহেব হতে পারে; আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখি নে! বকে' বকে' গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো, পয়সাটা দাও—উঠে চলে যাই। আর ভাল করে বক্‌সিস্ দাও তো না হয় পরশু এসে বলে যাব।"

সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া, বলিল— "পরশু নেহি বিবি!"

শান্তি বলিল, "দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল্, বিবি কি ?"

এড্‌ওয়ার্ডস্। পরশু নেহি, আজ রাৎকো হাম্‌কো খবর মিল্‌না চাহিয়ে।

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সরিষের তেল নাকে দিয়ে ঘুমো। আজ আমি দশ কোশ রাস্তা যাব—আস্‌বো— ওঁকে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার ?

এড্। ছুঁচো ব্যাটা কিস্কো কয়তা হ্যায় ?

শান্তি। যে বড় বীর—ভারি জাঁদরেল।

এড্। Great General হাম হো শক্তা হ্যায়-ক্লাইব্‌কা মাফিক্। লেকেন আজ হাম্‌কো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। শও-রূপেয়া বখ্‌সিস্ দেঙ্গে।

শান্তি। শই দাও আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ ছুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

এড্। ঘোড়ে পর্।

শান্তি। ঘোড়ায় চড়্‌তে জান্‌লে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেঙ্গ বাজায়ে ভিক্ষে করি ?

এড্। গদি পর্ লে যায়েগা।

শান্তি। কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে? আমার লজ্জা নাই?

এড্। ক্যা মুস্কিল, পান্শো রূপেয়া দেঙ্গে।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে যাবে?

সাহেব তখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ড্লে নামক একজন যুবা এন্সাইনকে দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন, "লিণ্ড্লে, তুমি যাবে?" লিণ্ড্লে শান্তির রূপযৌবন দেখিয়া বলিল, "আহ্লাদপূর্ব্বক।"

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিল লিণ্ড্লেও তৈয়ার হইল। শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল, "ছি, এত লোকের মাঝখানে? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই! আগে চল, ছাউনি ছাড়াই।"

লিণ্ড্লে ঘোড়ায় চড়িল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জ্জন প্রান্তর পাইয়া, শান্তি লিণ্ড্লের পায়ের উপর পা দিয়া লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ড্লে হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পাকা ঘোড়্সওয়ার।"

শান্তি বলিল, 'আমরা এমন পাকা ঘোড়্সওয়ার যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছি! রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া!'

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ড্লে রেকাব হইতে পা লইল। শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল। শান্তি চারি বৎসর সন্তানসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল। তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কি বাস করিতে পারিত? লিণ্ড্লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলেন। শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়াছিলেন, শান্তি সেই খানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সংবাদ অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিলেন,

"তবে আমি শীঘ্র গিয়া, মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান।" তখন দুইজনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এড্‌ওয়ার্ডস্ পাকা ইংরেজ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার লোক ছিল। শীঘ্র তাহার নিকটে খবর পৌঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ড্‌লে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এড্‌ওয়ার্ডস্ বলিলেন, "An imp of satan ! strike the tents."

তখন ঠক্-ঠক্ খটা-খট্ তাম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল। মাল গাড়ীতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে। হিন্দু মুসলমান, মাদ্‌রাজী, গোরা বন্দুক ঘাড়ে মস্ মস্ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ী ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর! সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্র ভাবিল, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবির-সংস্থাপন করা যাক্।

তখন শিবিরসংস্থাপন উচিত বোধ হইল। বৈষ্ণবের তাঁবু নাই; গাছতলায় গুণচট বা কাঁথা পাতিয়া, শয়ন করে। একটু হরিচরণামৃত খাইয়া রাত্রিযাপন করে। ক্ষুধা যে টুকু বাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী-ঠাকুরাণীর অধরামৃত পান করিয়া পরিপূরণ করে। শিবিরোপযোগী নিকটে একটী স্থান ছিল। একটা বড় বাগান—আম কাঁটাল বাবলা তেঁতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, "এইখানেই শিবির কর।" তারই পাশে একটা টিলা ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর, মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছুদূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল, টিলায় চড়।" নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন?"

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল, এই জ্যোৎস্নারাত্রে ঐ পর্ব্বতশিখরে নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।" সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ।

তখন "হরে মুরারে" উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উঁচু হইয়া উঠিল; এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুকরণ পূর্ব্বক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল। একজন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, এ কি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তান-বাহিনীর অগ্রবর্ত্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন— "এ আবার কি আনন্দ?"

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। টিলার ওপিঠে এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠ্বে, তারই জিত।"

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন, "চেন তোমরা! আমি জীবানন্দ গোস্বামী। সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছি।"

তুমুল নিনাদে কানন-প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, "চিনি আমরা! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।"

জীবা। বল "হরে মুরারে!"

কানন-প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "হরে মুরারে।"

জীবা। টিলার ওপিঠে শত্রু। আজ এই স্তূপশিখরে, এই নীলাম্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার সন্তানেরা রণ করিবে। ত্রস্ত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, "বন্দে মাতরম্!"

তখন কানন-প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল, "বন্দে মাতরম্।" ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পর্ব্বতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র সিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শিখরদেশে নীলাকাশপটে কামানশ্রেণী সহিত, ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,—

"তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্-গুম্ শব্দে সে মহাগীতি ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত আহত হইয়া, অশ্ব-অস্ত্রসহিত, টিলার উপর শুইল। আবার গুড়ুম্-গুম্ দধীচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, ইংরেজের বজ্র গড়াইতে লাগিল। চাষার কর্ত্তনীসম্মুখে সুপক্ক ধান্যের ন্যায় সন্তানসেনা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথাই জীবানন্দ, বৃথাই মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির ন্যায় সন্তানসেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জন্য 'হুর্‌রে! হুর্‌রে" শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে, পর্ব্বতমুক্ত বিশালতটিনীপ্রপাতবৎ দুর্দ্দম অলঙ্ঘ্য অজেয় বৃটিশসেনা, পলায়নপর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস, এইখানেই মরি।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।"

জীব। আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব। তখন পাছু ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, "কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।"

অনেক অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, "অমন নহে। হরিসাক্ষাৎ শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।"

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন, কেহ আসিবে না? তবে আমি একা চলিলাম।"

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন। বামহস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে "হরে মুরারে! হরে মুরারে!" যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই, এ সাহসে কোন ফল নাই—তথাপি "হরে মুরারে হরে মুরারে!" গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।"

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্ত্তি দেখিল, প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল, "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চল, জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।"

এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি আর কতকগুলি ফিরিল তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এ দিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে, সকলেই মনে করিল, সন্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান, শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য মার্ মার্ শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে;

গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন,—"সন্তানগণ! ঐ দেখ, শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুকৈটভ-নিসূদন কংশকেশি-বিনাশন রণে অবতীর্ণ,—লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠ! মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মার! লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।"

তখন "হরে মুরারে"র ভীষণ ধ্বনিতে কাননপ্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল 'সন্তান মাভৈঃ মাভৈঃ' রবে ললিততাল-ধ্বনিসংবলিত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় সর্ব্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। শিলা-প্রতিঘাতপ্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীবৎ রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত ভীত হইল। সেই সময়ে পঞ্চবিংশতিসহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে সমুদ্রপ্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সঙ্ঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পে-ষিত হইয়া যায়, তেমনই দুই সন্তানসেনা-সঙ্ঘর্ষে সেই বিশাল রাজ-সৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায় এমন লোক রহিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার রাত্রি!—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্ গুম্—সর্ব্বব্যাপী ধূম, আর কিছুই নাই। কেহ হুররে বলিতেছে না—কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ

ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে। কেহ ডাকিতেছে "মা!" কেহ ডাকিতেছে "বাপ!" কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান, একত্র জড়াজড়ি; জীবন্তে মৃতে, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটী মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। কোথায়, কোন নরদেহ মৃত অশ্বের নীচে পড়িয়াছে, সেখানে যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটী দুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তার পর যখন দেখিতে পায়, যে যাকে খুঁজিতেছে, সে নয়, তখন মশাল তুলিয়া সরিয়া যায়। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া, যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—যা খুঁজে, তা পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি; জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, "উঠ মা! কাঁদিও না।" শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল, সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজূটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্য্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা

সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া সেই মহাবল-বান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি, সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া ইহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।"

শান্তি শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই। সেই পুরুষ বলিলেন, "বুকে হাত দিয়া দেখ।

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই, সব শীতল।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন, "নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ —কিছুমাত্র নিশ্বাস বহিতেছে কি?

শান্তি দেখিল কিছুমাত্র না।

সেই পুরুষ বলিলেন, "আবার দেখ, মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া দেখ—কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি না?" শান্তি আঙ্গুল দিয়া দেখিয়া বলিল, "বুঝিতে পারিতেছি না।" শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল!

মহাপুরুষ, বাম হস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ! তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।"

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করিতেছে! নাকের আগে অঙ্গুলি রাখিল—একটু নিশ্বাস বহিতেছে! মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে?"

তিনি বলিলেন, "তাও কি হয় মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, "তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া রক্ত-সকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতাপাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন। তারপর বারংবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধে কার জয় হইল?"

শান্তি বলিল, তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না—সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া রহিল। জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরের আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।"

শান্তি বলিল, "আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না—এখন আর কি করিতে যাইব?"

জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শা। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে। এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোন অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে সন্তানেরা বলিবে, "জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্তভয়ে লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে।"

জী। সে কি শান্তি? লোকের অপবাদভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব? আমার কাজ মাতৃসেবা, যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃসেবাই করিব।

শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না, তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই, এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারী কাজ?

জী। শান্তি! তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না, আমার সুখ সন্তানধর্ম্মে—সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু যাইব কোথায়? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।

শা। তা কি আমি বলিতেছি? ছি! আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দুইজনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। চল এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।

জী। তারপর?

শা। তারপর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুইজনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুইজনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

হায়! আবার আসিবে কি মা। জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ব্ভে ধরিবে কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমন সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।"

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে মহাত্মন!—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধজয় করিয়া

সনাতনধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল ?

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।"

সত্য। মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, "হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে ? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে ?"

তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।"

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না ?"

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে

জ্ঞান, সেই সনাতনধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত-ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "হে মহাত্মন্! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেন না রাজ্য-শাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্—আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি,

ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব"।

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজ। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহ ত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়-শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্ত্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে! এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা. মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।

সমাপ্ত।

APPENDIX I.

History of the Sannyasi Rebellion,

From Warren Hasting's Letters in Gleig's Memoirs.

You will hear of great disturbances comitted by the Sannyasis, or wandering Fakeers who annually infest the province, about this time of the year in pilgrimages to Jaggarnaut, going in bodies of 1000 and some times even 10,000 men. An officer of reputation (Captain Thomas) lost his life in an unequal attack upon a party of these banditti, about 3000 of them, near Rungpore with a small party of Pergona Sepoys, which has made them more talked of than they deserve. The revenue however, has felt the effects of their ravages in the northern districts. The new establishment of Sepoys which is now forming on the plan enjoined by the Court of Directors and the distribution of them ordered for the internal protection of the provinces will, I hope effectually secure them here-after from these incursions,—"Hastings to Sir George Colebrook—dated 2nd, February 1773.—Gleig's Memoirs Vol. 1282.

Our own provinces has worn something of a warlike appearance this year, having been infested by a band of Sannyasies who have defeated two small parties of purgunnah Sepoys (a rascally corps) and cut off the two officers who commanded them. One was Captain Thomas, whom you know. Four battalions of the brigade Sepoys are now in pursuit of them, but they will not stand any engagement and have neither camp equipage nor even clothes, to retard their flight. Yet I hope we shall yet make an example of some of them as they are shut in by rivers which they cannot pass when closely pursued.

The history of the people is curious. They inhabit or rather possess the country lying south of the hills of Tibbet from Caubul to China. They go mostly naked, they have neither towns, houses nor families; but rove continully from place to place recruiting their number with the healthiest children they can steal in the countries through which they pass. Thus they are the stoutest and the most active men in India. Many are Merchants. They are all pilgrims and held by all castes of Gentoos in great veneration. This infatuation prevents our obtaining any intelligence of their motions or aid from the country against them, notwithstanding very rigid orders which have been published for these purposes in so much that they often appear in the heart of the province as if they dropt from heaven. They are hardy,

bold and enthusiastic to a degree surpassing credit. Such are the Sannyassies, the Gipsies of Hindustan.

•We have dissolved all the purgunnah Sepoys and fixed stations of the brigade Sepoys on our frontiers, which are to be employed only in the defence of the province, and to be relieved every three months. This I hope will secure the pace of the country against future irruptions and as they are no longer to be on ployed in the collections, the people will be freed from the oppressions of our own plunderers. "Hastings to Josias Du Pre.—9th March 1773."

We have lately been much troubled here by hordes of desperate adventurers called Sannyasis, who have overrun the province in great numbers and committed great depredations. The particulars of these disturbances and of our endeavours to repel them you will find in our general letters and consultations which will acquit the government of any degree of blame from such a calamity. At this time we have five battalions of Sepoys in pursuit of them, and I have still hopes of exacting ample vegeance for the mischief they have done us, as they have no advantage over us but in the speed with which they fly from us. A minute relation of these advanturers can not amuse you nor indeed are they of great moment for which reason give me leave to drop the subjet, and lead you to one in which you can not but be more interested &c. 'Hastings to Pauling—dated 31st. March 1377—para 4—Gleig's Memoirs of Hastings—294 Vol. I.

In my last I mentioned that we had every reason to suppose the Sannyasie Fakeers had entirely evacuated the company's possessions. Such were the advices I then received, and their usual progress made this highly probable. But it seems they were either disappointed in crossing the Burramputrah river. or they changed their intention, and returned in several bands of about 2000 or 3000 each, appearing unexpectedly in different parts of the Rungpoor and Dinagepoor provinces, For in spite of the strictest orders issued and the severest penalties threatened to the inhabitants in case they fail in giving intelligence of the approach of the Sannyasies, they are so infatuated by superstition as to be backward in giving the information, so that the banditti are sometimes advanced into the very heart of provinces before we know anything of their motions ; as if they dropt form heaven to punish the inhabitants for their folly. One of these parties falling in with a small detachment commanded by Captain Edwards, an engagement ensued wherein our Sepoys gave way. Captain Edwards lost his life in endeavouring to cross a Nullah. This detachment was formed of worst of our perganna Sepoys, who seem-

ed to have behaved very ill. This success elated the Sannyasies, and I heard of their depredation from every quarter in those districts. Captain Stewart, with the nineteenth battalion of Sepoys who was before employed against them, was vigilant in the pursuit wherever he could hear of them, but to no purpose. They were gone before he could reach the places to which he was directed I ordered another battalion from Barrampoor to march immediately to co-operate with Captain Stewart, but to act separately in order to have the better chance of falling in with them. At the same time I orderd another battalion to march from the Dinapoor Station through Tyroot and by the northern frontier of the Purneah province following the track which the Sannyasies usually took, in order to intercept them in case they marched that way. This battalion after acting against the Sannyasies if occasion offered, was directed to pursue their march to Cooch Behar, where they are to join Captain Jones and assist in the reduction of that country.

Several parties of the Sannyasies having entered into the Purneah province, burning and destroying many villages there, the Collector applied to Captain Brook who had just arrived at Panty near Rajmahal, with his newly raised battalion of light infantry. That officer immediately crossed the river and entered upon measures against the Sannyasies and had very near fallen in with a party of them, just as they were crossing the Cosa river to escape out of that province They arrived on the opposite bank before their rear had entirely crossed but too late to do any execution among them. It is apparent now that the Sannyasies are glad to escape as fast as they can out of the Company's possession. yet I am still in hopes, that some of the many detachments now acting against them may fall in with some of their parties, and punish them exemplarily for their audacity

It is impossible but that on account of the various depredations which the Sannyassies have committed, the revenue must fall short in some of the company's districts as well from [illegible] from pretended losses. The Board of revenue aware of this last consideration, have come to the resolution of admitting no pleas for a reduction of revenue but such as are attended with circumstances of conviction, and by this means they hope to prevent, as much as in their power, all impositions on the government, and to render the loss to the Company as inconsiderable as possible Effectual means will be used by stationing some small detachments at proper posts on our frontier to prevent any future incursions from the Sannaysie Fakeers, or any other roving banditti, a measure which only the extraordinary audacity of their last incur-

On the 31st March 1773, Warren Hastings plainly acknowledges that the commander who had succeeded Captain Thomas unhappily underwent the same fate; that four battalions of the army were then actively engaged against the banditti but that in spite of the militia levies called from the landholders their combined operations had been fruitless. The revenue could not be collected, the inhabitants made common cause with the marauders, and the whole rural administration was unhinged. Such incursions were annual episodes in what some have been pleased to represent as the still life of Bengal.—"Hunter's Annals of Rural Bengal, p. 72.
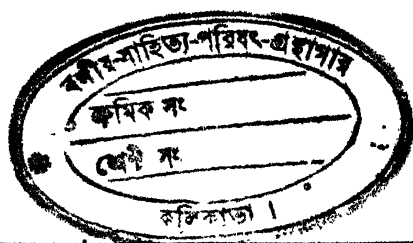
চন্দ্রশেখর

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

অনুজ

শ্রীমান্ বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে

এই

গ্রন্থ

স্নেহচিহ্ন স্বরূপ

উপহার

প্রদত্ত হইল।

বিজ্ঞাপন।

"চন্দ্রশেখর" প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু একণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের মতাক্ষরীন নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।

চন্দ্রশেখর।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালক-বালিকা।

ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটী বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বা-শয্যায় শয়ন করিয়া, একটী ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ, নদী, বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার নাম শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক।

মাথার উপরে শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূল-বিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর-তর রব সে ব্যঙ্গসঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎ সুকুমার বন্য কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলায় পরাইল। আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে। নিকটে হৃষ্টা পুষ্টা একটী গাই চরিতেছে দেখিয়া, শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল। এইরূপ ইহাদের সর্ব্বদা হইত। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক, নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়িয়া দিত, আম্রের সময়ে সুপক্ক আম্র পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে বসিল। কে আগে দেখিয়াছে? কোন্‌টী আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা। মিথ্যা কথা। শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছি না।

নৌকাগণ। কয়খানা নৌকা যাইতেছে বল দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠারখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না; একবার গণিয়া নয়খানা হইল, আর একবার গণিয়া একুশখানা হইল। তার পর গণনা ছাড়িয়া, উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিতেছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে।

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা! বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাৎ আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কয় জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয়? কয় জন বাঁচিয়া থাকে? কয় জন ভালবাসার যোগ্য? বার্দ্ধক্যে বাল্য-প্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর!

বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুরমুখ—সেই সরল কটাক্ষ—

কোথায় কালপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতি মাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না—কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরাশি। প্রতাপও দরিদ্র।

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের ষোল কলা পূরিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে? সে অরণ্যমধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে, দুই জনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল, আয় শৈবলিনী! সাঁতার দিই। দুই জনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুই জনেই পটু তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না। বর্ষাকাল—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুই জনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল; ফেনচক্রমধ্যে, সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয়, রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল।

সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল

না—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুই জনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে!"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন—এইখানেই!" প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল, মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বর মিলিল।

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পান্সি বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল—প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী—চন্দ্রশেখর শর্ম্মা।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাঁহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।

প্রতাপের মাতা ছাড়িল-না। চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, সেদিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন।—দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ,অথচ সংসারী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই; দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহ ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দার-পরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল। প্রথমতঃ স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে,—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন কাহাকে দেন মনে থাকে না। খরচ নাই—অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু চন্দ্রশেখর স্থির করিলেন, যদি বিবাহ করি, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না। কেন না, সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। সংসার বন্ধনে মুগ্ধ হওয়া হইবে না।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনীকে দেখিয়া, সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল। ভাবিয়া, চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া, শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?

এই বিবাহের আট বৎসর পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

প্রথম খণ্ড।

পাপীয়সী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দলনী বেগম।

সুবে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে রঙ্গমহলে একস্থানে বড় শোভা। রাত্রির প্রথম প্রহর এখন

অতীত হয় নাই। প্রকোষ্ঠ মধ্যে, সুরঞ্জিত হর্ম্ম্যতলে, সুকোমল গালিচা পাতা। রজত-দীপে গন্ধতৈলে, জ্বালিত আলোক জ্বলিতেছে। সুগন্ধ-কুসুমদামের ঘ্রাণে গৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। কিংখাবের বালিশে একটী ক্ষুদ্র মস্তক বিন্যস্ত করিয়া একটী ক্ষুদ্র-কায়া বালিকাকৃতি যুবতী শয়ন করিয়া গুলেস্তাঁ পড়িবার জন্য যত্ন পাইতেছে। যুবতী সপ্তদশবর্ষীয়া, কিন্তু খর্ব্বাকৃতা, বালিকার ন্যায় সুকুমার। গুলেস্তাঁ পড়িতেছে, এক একবার উঠিয়া চাহিয়া দেখিতেছে এবং আপন মনে কতই কি বলিতেছে। কখন বলিতেছে, "এখনও এলেন না কেন?" আবার বলিতেছেন "কেন আসিবেন? হাজার দাসীর মধ্যে আমি একজন দাসীমাত্র, আমার জন্য এতদূর আসিবেন কেন?" বালিকা আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। আবার অল্পদূর পড়িয়াই বলিল, "ভাল লাগে না। ভাল, নাই আসুন, আমাকে স্মরণ করিলেই ত আমি যাই। তা আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে একজন বৈ ত নই।" আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে আরম্ভ করিল, আবার পুস্তক ফেলিল, বলিল, "ভাল, ঈশ্বর কেন এমন করেন? একজন কেন আর একজনের পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?" তখন যুবতী পুস্তক ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল। নির্দ্দোষগঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশি-তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল—স্বর্ণরচিত সুগন্ধ-বিকীর্ণকারী উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল—তাহার অঙ্গ-সঞ্চালন-মাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্যমাত্রে তরঙ্গ উঠে, তেমনি তরঙ্গ উঠিল।

তখন সুন্দরী এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল এবং ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, গীত আরম্ভ করিল—যেন শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া গাইতেছে। এমত সময়ে, নিকটস্থ প্রহরীর অস্ত্রঝঞ্ঝনা-শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বালিকা চমকিয়া উঠিয়া, ব্যস্ত হইয়া, দ্বারে গিয়া

দাঁড়াইল। দেখিল, নবাবের তাঞ্জাম। নবাব মীরকাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন-গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দলনী বিবি, কি গীত গায়িতেছিলে?" যুবতীর নাম বোধ হয়, দৌলতউন্নিসা। নবাব তাহাকে সংক্ষেপার্থ "দলনী" বলিতেন। এজন্য পৌরজন সকলেই "দলনী বেগম" বা "দলনী বিবি" বলিত।

দলনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল। দলনীর দুর্ভাগ্যক্রমে নবাব বলিলেন, "তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও—আমি শুনিব।"

তখন মহা গোলযোগ বাধিল। তখন বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাঁধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল, বোধ হইল। নবাব বলিলেন, "হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।" তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন, নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুরবোধ নাই। তারপর, তার পর, দলনীর মুখ ফুটিল না! দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ কথা শুনিল না—কিছুতেই ফুটিল না! মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরু কবির কবিতা-কুসুমের ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয় সম্বোধনের ন্যায়, ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? রাগ না কি?"

দ। কলিকাতার ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটা আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সম্মুখে পুনর্ব্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, তবে অবশ্য দিব।"

দ। কাঁটা পড়িবে কেন?

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন, তুমি কি সে সকল কথা শুন নাই?"

"শুনিয়াছি" বলিয়া দলনী নীরব হইল। মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "দলনী বিবি, অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছ?"

দলনী বলিল, "আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন?—আমি বালিকা দাসী, এ সকল কথা আমার বলা নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু বলিবার একটী অধিকার আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভালবাসেন।"

নবাব বলিলেন, "সে কথা সত্য দলনী,—আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে যেমন ভালবাসি, আমি কখন স্ত্রীজাতিকে এরূপ ভালবাসি নাই বা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই।"

দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল। দলনী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল—তাহার চক্ষে জল পড়িল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?"

মীরকাসেম কিছু মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্ত আমারই, এই জন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি—আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছে, তাহাতে তাহারাই রাজা, আমি রাজা নহি। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি।"

দলনী মনে মনে বাঙ্গালার অধীশ্বরের শত শত প্রশংসা করিল। বলিল,—"প্রাণেশ্বর! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আমি কি বলিব? কিন্তু আমার একটী ভিক্ষা আছে। আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না।"

মীরকা। এ বিষয়ে কি বাঙ্গালার নবাবের কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে? না বালিকার কর্ত্তব্য যে, এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়?

দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, "আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এ সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটী ভিক্ষা চাই।"

"কি?"

"আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন?"

"কেন তুমি যুদ্ধ করিবে না কি? বল, গুরগন খাঁকে বরতরফ করিয়া তোমাকে বাহাল করি!"

দলনী আবার অপ্রতিভ হইল, কথা কহিতে পারিল না। মীরকাসেম তখন সস্নেহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইতে চাও?"

"আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া।" মীরকাসেম অস্বীকৃত হইলেন। কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'জাহাপনা! আপনি গণিতে জানেন; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব?"

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "তবে কলমদান দাও।"

দলনীর আজ্ঞাক্রমে পরিচারিকা সুবর্ণনির্ম্মিত কলমদান আনিয়া দিল।

মীরকাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলেন?"

মীরকাসেম বলিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।"

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুনসীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে স্থান আছে—

তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমার গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরে দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?”

মীরমুনসী তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভীমা পুষ্করিণী।

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারি ধারে, ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কাল ছায়া-সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটী ঘাটের পাশে, কয়েকটী লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল পর্য্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অল্পান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না; আমরা জল নই। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া বাহু বিলম্বিত অলঙ্কার-শিঞ্জিতের তালে, তালে নাচে। হৃদয়োপরি গ্রথিত জলপুষ্পের মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণ কুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মৃদু বায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিম্বাধরে জল স্পৃষ্ট করে; বক্তু মধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে, সূর্য্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে; জল পতনকালে বিন্দে বিন্দে শত সূর্য্য,

ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদ-সঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই-ই সমান। জল চঞ্চল; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কে?

পুষ্করিণীর শ্যাম-জলে স্বর্ণ-রৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তাল-গাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল, "ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল বাড়ী যাই।"

শৈবলিনী। কেহ নাই, ভাই, চুপি চুপি একটী গান গা-না।

সু। দূর হ! পাপ! ঘরে চ।

শৈ। ঘরে যাব না লো সই!

আমার মদনমোহন আস্‌চে ওই।

হায়! যাব না লো সই!

সু। মরণ আর কি? মদনমোহন ত ঘরে বোসে, সেইখানে চল না।

শৈ। তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী, ভীমার জল শীতল দেখিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

সু। নে, এখন রঙ্গ রাখ। রাত হলো—আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। আবার আজ ক্ষেমির মা বল্‌ছিল, এদিকে একটা গোরা এয়েছে।

শৈ। তাতে তোমার আমার ভয় কি?

সু। আ মলো, তুই বলিস্ কি? ওঠ্, নহিলে আমি চলিলাম।

শৈ। আমি উঠ্‌বো না—তুই যা।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পুনর্ব্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ লো, সত্য সত্য তুই কি এই সন্ধ্যাবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি?"

শৈবলিনী কোন উত্তর করিল না; অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া

দেখাইল। অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুসারে সুন্দরী দেখিল, পুষ্করিণীর অপর পারে এক তালবৃক্ষতলে, সর্ব্বনাশ! সুন্দরী আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পিত্তল-কলস, গড়াইতে গড়াইতে, ঢক্-ঢক্ শব্দে উদরস্থ জল উদ্গীর্ণ করিতে করিতে, পুনর্ব্বার বাপীজলমধ্যে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটী ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্র বসনে কবরী-সমেত মস্তকের অর্দ্ধভাগ মাত্র আবৃত করিয়া প্রফুল্লরাজীবৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘমধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে এই স্বর্ণ কমল ফুটিল।

সুন্দরী পলাইয়া গেল, কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তালগাছের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া, ঘাটের নিকটে আসিল।

ইংরেজ দেখিতে অল্পবয়স্ক বটে। গুম্ফ বা শ্মশ্রু কিছুই ছিল না। কেশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষুও ইংরেজের পক্ষে কৃষ্ণাভ। পরিচ্ছদের বড় জাঁক-জমক এবং চেন, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কারের কিছু পারিপাট্য ছিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া জলের নিকট আসিয়া বলিল, "I come again fair Lady."

শৈবলিনী বলিল, "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

"Oh—ab—that nasty gisberish—I must speak it I suppoye. হম্ agair আয়া হ্যায়।"

শৈ। কেন? যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায়?

শৈ। বলি, যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। যম! John yon mean? হম্ জন নহি,—হম্ লরেন্স্।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখিলাম,—লরেন্স্ অর্থে বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স্ ফষ্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। লরেন্স্ ফষ্টর, পুষ্করিণীর

পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আম্রবৃক্ষতল হইতে অশ্বমোচন করিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক টিবিয়ট নদীর তীরস্থ পর্ব্বত-প্রতিধ্বনি-সহিত শ্রুত গীতি স্মরণ করিতে করিতে চলিলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল, সেই শীতল দেশের তুষাররাশির সদৃশ যে মেরি ফষ্টরের প্রণয়ে বাল্যকালে অভিভূত হইয়াছিলাম, এখন সে স্বপ্নের মত। দেশভেদে কি রুচি-ভেদ জন্মে ? তুষারময়ী মেরি কি শিখারূপিণী উষ্ণ দেশের সুন্দরীর তুলনীয়া ? বলিতে পারি না।"

ফষ্টর চলিয়া গেলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে জল কলস পূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্তপবনারূঢ় মেঘবৎ মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া, নামাবলীতে কটিদেশের সহিত উভয় জানু বন্ধন করিয়া মৃৎপ্রদীপ-সম্মুখে তুলটে হাতে-লেখা পুথি পড়িতেছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার পর একশত বৎসর অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার দীর্ঘ; তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত— তদুপরি চন্দন-রেখা।

শৈবলিনী গৃহপ্রবেশকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্রি হইল, তখন কি বলিব ?" কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মসূত্রের সূত্রবিশেষের অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, "বলিলেন, আজি এত অসময়ে বিদ্যুৎ কেন ?",

শৈবলিনী বলিল, "আমি ভাবিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে !"

চন্দ্র। কেন বকিব ?

শৈ। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই।

চন্দ্র। বটেও ত—এখন এলে না কি? বিলম্ব হইল কেন?

শৈ। একটা গোরা আসিয়াছিল। তা সুন্দরী ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। ভয়ে একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, "আর আসিও না," এই বলিয়া আবার শাঙ্করভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি অত্যন্ত গভীরা হইল। তখনও চন্দ্রশেখর, প্রমা মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদি তর্কে নিবিষ্ট। শৈবলিনী প্রথমত, স্বামীর অন্নব্যঞ্জন, তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া পার্শ্বস্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এ বিষয় চন্দ্রশেখরের অনুমতি ছিল—অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি বিদ্যালোচনা করিতেন, অল্পরাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না।

সহসা সৌধোপরি হইতে পেচকের গম্ভীর কণ্ঠ শ্রুত হইল। তখন চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া, পুথি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, আলস্যবশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। মুক্ত বাতায়নপথে কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্তা সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহ-সরোবরে চন্দ্রের আলোকে পদ্ম ফুটিয়াছে! তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে শৈবলিনীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূযুগতলে, মুদ্রিত পদ্মকোরক সদৃশ লোচন-পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে;—সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমার রসপূর্ণতাম্বূলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া,

মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখস্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার, জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল; আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তিসুস্থির হইল। সেই বিলাস-চাঞ্চল্য-শূন্য সুষুপ্তিসুস্থির বিংশতি বর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষু অশ্রুবহিল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। ভাবিলেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি? এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া, আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমিত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিরত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া, পাড়িয়া এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে মীর মুন্সীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। নবাবের কাজ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লরেন্স ফষ্টর।

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের একটী ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর

তথাকার ফ্যাক্টর বা কুঠিয়াল। লরেন্স অল্প বয়সে মেরি ফষ্টরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী স্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখনকার ইংরাজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত। ফষ্টর অল্পকালেই সে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মেরির প্রতিমা তাঁহার মন হইতে দূর হইল। একদা তিনি প্রয়োজনবশতঃ বেদগ্রামে গিয়াছিলেন—ভীমা পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল পদ্মস্বরূপা শৈবলিনী তাঁহার নয়নপথে পড়িল। শৈবলিনী গোরা দেখিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু ফষ্টর ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া গেলেন। ফষ্টর ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কটা চক্ষের অপেক্ষা কাল চক্ষু ভাল, এবং কটা চুলের অপেক্ষা কাল চুল ভাল। অকস্মাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, সংসার-সমুদ্রে স্ত্রীলোক তরণীস্বরূপ—সকলেরই সে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া বাঙ্গালিসুন্দরীকে এ সংসারে সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা মন্দ করেন না। অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে, ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে,—শৈবলিনী কি ভজিবে না? ফষ্টর কুঠির কারকুনকে সঙ্গে করিয়া আবার বেদগ্রামে আসিয়া বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। কারকুন্ শৈবলিনিকে দেখিল—তাহার গৃহ দেখিয়া আসিল।

বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজু নামে ভয় পায়, কিন্তু একটী একটী এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখিতে চাহে। শৈবলিনার সেই দশা ঘটিল। শৈবলিনী, প্রথম প্রথম তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে, ফষ্টরকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইত। পরে কেহ তাহাকে বলিল, "ইংরেজেরা মনুষ্য ধরিয়া সদ্য ভোজন করে না—ইংরেজ অতি আশ্চর্য্য জন্তু—একদিন চাহিয়া দেখিও।" শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—দেখিল, ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া সদ্য ভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাঁহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল। তাহাও পাঠক জানেন।

অশুভক্ষণে শৈবলিনী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অশুভ-ক্ষণে চন্দ্রশেখর তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী যাহা, তাহা ক্রমে বলিব; কিন্তু সে যাই হউক, ফষ্টরের যত্ন বিফল হইল।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফষ্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে, "পুরন্দরপুরের কুঠিতে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তোমাকে কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।" যিনি কুঠিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফষ্টরের সত্বই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল।

শৈবলিনীর রূপ ফষ্টরের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। দেখিলেন, শৈবলিনীর আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভসংবরণে অক্ষম এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না, যে এ কার্য্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভাল। এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্যে অধর্ম্ম আছে, অতএব অকর্ত্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য-সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।

লরেন্স্ ফষ্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সংবরণ করিলেন না—বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্মশব্দ লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সাধ্যাসাধ্যও বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "Now or never!"

এই ভাবিয়া, যেদিন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সেদিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজকর্ম্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই। গ্রাম-

বাসীরা চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদ ধ্বনি শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাইতি হইতেছে—অনেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, বাড়ী লুঠিয়া ডাকাইতেরা একে একে নির্গত হইল; বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, কয়েকজন বাহকে একখানি শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব। দেখিয়া সকলে সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দেখিল, দ্রব্যসামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই। কেহ কেহ বলিল, "সে কোথায় লুকাইয়াছে, এখনই আসিবে।" প্রাচীনেরা বলিল, "আর আসিবে না—আসিলেও চন্দ্রশেখর তাহাকে আর ঘরে লইবে না। যে পাল্কী দেখিলে, ঐ পাল্কীর মধ্যে সে গিয়াছে।

যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বসিল। বসিয়া বসিয়া, নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল। ঢুলিয়া ঢুলিয়া, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিল না।

সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথম পরিচিত করিয়াছি, সেই সকলের শেষে উঠিয়া গেল। সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী, শৈবলিনীর সখী। আবার তাঁহার কথা উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া এস্থলে এ পরিচয় দিলাম।

সুন্দরী বসিয়া বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল। গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নাপিতানী।

ফষ্টর স্বয়ং শিবিকা সমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল।

শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাস দাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন আবার হিন্দু দাসদাসী কেন?

ফষ্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে হইবে—বড় নৌকায় বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর জন্য স্ত্রীলোকের আরোহণোপযোগী যানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি যানান্তরে কলিকাতায় গেলেন। এমন শঙ্কা ছিল না যে, তিনি স্বয়ং শৈবলিনীর নৌকার সঙ্গে না থাকিলে, কেহ নৌকা আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীর উদ্ধার করিবে। ইংরেজের লোক শুনিলে কেহ নিকটে আসিবে না। শৈবলিনীর নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিয়া গেলেন।

প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃত তরণী উত্তরাভিমুখ চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল। তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্তকে যত পার বিশ্বাস করিও কিন্তু প্রভাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাতবায়ু বড় মধুর। চোরের মত পা-টিপি-টিপি আসিয়া, এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকা-দাম, সেখানে সুগন্ধিবকুলের শাখা লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে—কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গগ্লানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী—দেখিতেছ, এই ক্রীড়াশীল মধুপ্রকৃত প্রভাতবায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিতা করিতেছে; আকাশস্থ দুই একখানা অল্প কাল মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে; তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু নাচাইতেছে; স্নানাবগাহন-নিরতা কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে—নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার কানের কাছে মধুর সংগীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে বায়ু বড় ধীরপ্রকৃতি,—বড় গম্ভীরস্বভাব, বড় আড়ম্বরশূন্য—আবার সদানন্দ! সংসারে যদি সকলেই এমন হয় ত কি না হয়! দে নৌকা খুলিয়া দে! রৌদ্র উঠিল—তুমি দেখিলে

যে বীচিরাজির উপরে রৌদ্র জ্বলিতেছে, সেগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় বড় হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে; গাত্রমার্জ্জনে অন্যমনা সুন্দরীদিগের মৃৎকলসী তাহার উপর স্থির থাকিতেছে না, বড় নাচিতেছে; কখন কখন ঢেউগুলা স্পর্দ্ধা করিয়া সুন্দরীদিগের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে; আর যিনি তীরে উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—মাথা কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে,—"দেহি পদপল্লবমুদারম্!" নিতান্ত পক্ষে পায়ের একটু অলক্তকরাগ ধুইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কানে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী রাগিণীতে কাণের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জ্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা; তরঙ্গসকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল—তুমি ভাব বুঝিয়া পবনদেবকে প্রণাম করিয়া, নৌকা তীরে রাখিলে।

শৈবলিনীর নৌকার দশা ঠিক এইরূপ ঘটিল। অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা, প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না; রক্ষকেরা ভদ্রহাটির ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে, এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙ্গাপেড়ে শাড়ীপরা—পাড়ার রাঙ্গা দেওয়া আঁচলা আছে—হাতে আলতার চুপড়ী। নাপিতানী নৌকার উপর অনেক কাল কাল দাড়ী দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। দাড়ীর অধিকারিগণ অবাক্ হইয়া নাপিতানীকে দেখিতেছিল।

একটা চরে শৈবলিনীর পাক হইতেছিল—এখনও হিন্দুয়ানি আছে—একজন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল। একদিনে কিছু বিবি সাজা যায় না। ফষ্টর জানিতেন যে, শৈবলিনী যদি না পলায়, অথবা প্রাণত্যাগ না করে, তবে সে অবশ্য একদিন টেবিলে বসিয়া

যবনের কৃত পাক, উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু এখনই তাড়াতাড়ি কি? এখনই তাড়াতাড়ি করিলে সকল দিক নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া ফষ্টর ভৃত্যদিগের পরামর্শমতে শৈবলিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল, নিকটে এক-জন দাসী দাঁড়াইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। নাপিতানী সেই দাসীর কাছে গেল; বলিল, "হাঁ গা তোমরা কোথা থেকে আস্‌চ গা?"

চাকরাণী রাগ করিল—বিশেষ সে ইংরেজের বেতন খায়—বলিল, তোর্ তা কি রে মাগী! আমরা হিল্লী, দিল্লী, মক্কা থেকে আস্‌ছি।"

নাপিতানী অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"বলি তা নয়, বলি আমরা নাপিত—তোমাদের নৌকায় যদি মেয়ে ছেলে কেহ কামায়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

চাকরাণী একটু নরম হইল। বলিল, "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল যে, তিনি আল্‌তা পরিবেন কি না। যে কারণেই হউক, শৈবলিনী অন্যমনা হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন; বলিলেন, "আল্‌তা পরিব।" তখন রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া দাসী নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল। সে স্বয়ং পূর্ব্বমত পাকশালার নিকট নিযুক্ত রহিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিল এবং তাহার একটী চরণ লইয়া আল্‌তা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নাপিতানী, তোমার বাড়ী কোথা?"

নাপিতানী কথা কহিল না। শৈবলিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাপিতানী, তোমার নাম কি?

তথাপি উত্তর পাইলেন না। "নাপিতানী তুমি কাঁদ্‌চ?"

নাপিতানী মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

"হাঁ কাঁদ্‌চ।" বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। নাপিতানী বাস্তবিক কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন

মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

শৈবলিনী বলিল, "আমি আসতে মাত্র চিনেছি। আমারি কাছে ঘোমটা! মরণ আর কি? তা এখানে এলি কোথা হ'তে?"

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া, 'শীঘ্র যাও! আমার এই শাড়ী পর, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আলতার চুবড়ী নাও। ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যাও।"

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এলে কেমন করে?"

সু। কোথা হইতে আসিলাম—কেমন করিয়া আসিলাম—সে পরিচয়, দিন পাইতে এর পর দিব। তোমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। লোকে বলিল, পাল্কী গঙ্গার পথে গিয়াছে। আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া, হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। লোকে বলিল, বজরা উত্তরমুখে গিয়াছে। অনেক দূর, পা ব্যথা হইয়া গেল। তখন নৌকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে পাছে আসিয়াছি। তোমার বড় নৌকা—চলে না, আমার ছোট নৌকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি।

শৈ। একলা এলি কেমন করে?

সুন্দরীর মুখে আসিল, "তুই কালামুখী সাহেবের পাল্কী চ'ড়ে এলি কেমন করে?" কিন্তু অসময় বুঝিয়া সে কথা বলিল না। বলিল, "একলা আসি নাই।" আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গী একটু দূরে রাখিয়া, আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি।"

শৈ। তার পর?

সু। তার পর তুমি আমার এই শাড়ী পর, এই আলতার চুপড়া নাও, ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া চলিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে তীরে যাইবে। ডিঙ্গীতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না—ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গী খুলিয়া দিয়া তোমার বাড়ী লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর তোমার দশা ?"

সু। আমার জন্যে ভাবিও না। বাঙ্গালায় এমন ইংরেজ আসে নাই যে, সুন্দরী ব্রাহ্মণীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী ; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ্ নাই। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ী যাইব। বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা। তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার নন্দায়ের এখনও আহার হয় নাই। আজ হবে কি না, তাও বলিতে পারি না।

শৈ। ভাল, আমি যেন গেলাম। গেলে, সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি ?

সু। ইস—লো! কেন নেবেন না ? না নেওয়াটা প'ড়ে রয়েছে আর কি কি ?

শৈ। দেখ। ইংরেজে আমায় কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে ?

সুন্দরী বিস্মিত হইয়া শৈবলিনীর মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রতি মর্ম্মভেদী তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল—গর্বিতস্পৃষ্ট বিষধরের ন্যায় গর্ব্বিতা শৈবলিনী মুখ নত করিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কথা বলবি ?"

শৈ। বলিব। সু। এই গঙ্গার উপর ?

শৈ। বলিব। তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অমনি বলিতেছি। সাহেবের সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন না।

সু। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিও না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, অধর্ম্ম করিবেন না, তবে আর মিছা কথায় সময় নষ্ট করিও না।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল। একটু কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখন ঘুচিবে ?"

সুন্দরী কোন উত্তর করিল না। শৈবলিনী বলিতে লাগিল, "ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলা আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে কি না যে, ঐ উহাকে ইংরেজে লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখন কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে? আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি ঘরে গিয়া কি প্রকারে মুখ দেখাইব?"

সুন্দরী বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সে ত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।"

শৈ। কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু,—

সু। কেন, স্বামী? এ নারী-জন্ম আর কাহার জন্য?

শৈ। সব ত জান—

সু। জানি। জানি যে, পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলা ঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কি না, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাঙ্তা দিয়া সাজান নাই—মানুষ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত—তুমি পাপিষ্ঠা—তাঁকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে। তা যাক্ সে সব কথা দূর হৌক্—এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণ-সেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? আমার রাগ হইতেছে।

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি—নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুঙ্গের যাইতেছি। যাই, দেখি মুঙ্গের কেমন দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মিলে কি না। মরিতে হয়, না হয় মরিব—মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও। তুমি যাও।

তখন সুন্দরী আর কিছু বলিল না। রোদন সংবরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল; বলিল, "ভরসা করি তুমি শীঘ্র মরিবে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়! মুঙ্গের যাইবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়। ঝড়ে হোক্, তুফানে হোক্, নৌকা ডুবিয়া হোক্, মুঙ্গের পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।

এই বলিয়া, সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, আলতার চুপড়ী জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন।

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।"

রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইত। বিশেষ জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।

রাজপুরুষ বলিলেন, "অথবা রাজার অপ্রিয় সংবাদ বুদ্ধিমান লোকে প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব।"

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রাজকর্ম্মচারী তাঁহার পাথেয় দিতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা গ্রহণ করেন না কাহারও যাচে দান গ্রহণ করেন না।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন, দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এত দিন আহার নিদ্রায় কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহ-বন্ধে পড়িতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এই জন্য আমার এ আহ্লাদ? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেম অধিক—কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ! আমার যে ভৃত্য লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্লকমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবদ্বাক্য অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব। কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব?

অকস্মাৎ চন্দ্রশেখরের মনে অত্যন্ত ভয় সঞ্চার হইল। যদি বাড়ী গিয়া শৈবলিনীকে না দেখিতে পাই? কেন দেখিতে পাইব না? যদি পীড়া হইয়া থাকে? পীড়া ত সকলেরই হয়—আরাম হইবে। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, পীড়ার কথা মনে হওয়াতে এত অসুখ হচ্ছে কেন? কাহার না পীড়া হয়? তবে যদি কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকে, ঈশ্বর শৈবলিনীকে আরাম করিবেন, স্বস্ত্যয়ন করিব। যদি

পীড়া ভাল না হয়! চন্দ্রশেখরের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, ভগবান্ আমায় এ বয়সে এ রত্ন দিয়া আবার কি বঞ্চিত করিবেন? তাহারই বা বিচিত্র কি—আমি কি তাঁহার এতই অনুগৃহীত যে, তিনি আমার কপালে সুখ বই দুঃখ বিধান করবেন না? হয় ত ঘোরতর দুঃখ আমার কপালে আছে। যদি গিয়া দেখি শৈবলিনী নাই—যদি গিয়া শুনি যে, শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। চন্দ্রশেখর অতি দ্রুত-পদে চলিলেন। পল্লীমধ্যে পঁহুছিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসীরা তাঁহার মুখ-প্রতি অতি গম্ভীর ভাবে চাহিয়া দেখিতেছে—চন্দ্রশেখর সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চুপি চুপি হাসিল। কেহ কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—ভীত হইলেন—অন্যমনা হইলেন—কোন দিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে, ভৃত্য বহির্ব্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন, উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই,—চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে স্থানে পোড়া মশাল; স্থানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা। চন্দ্রশেখর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সকল ঘরেরই দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। দেখিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন, সে বাটীর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন চন্দ্রশেখর প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিকৃত-কণ্ঠে ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

কেহ উত্তর দিল না; চন্দ্রশেখরের বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রোরুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল।

চন্দ্রশেখর আবার ডাকিলেন। গৃহমধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, কেহ উত্তর দিল না।

ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত তরণীর উপর গঙ্গাম্বুসঞ্চারী মৃদুপবন হিল্লোলে, ইংরেজের লাল নিশান উড়িতেছিল—মাঝিরা সারি গায়িতেছিল।

* * * * * *

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সয়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার সংগৃহীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয়, গ্রন্থগুলি সমস্ত একে একে আনিয়া একত্র করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু যাজ্ঞবল্ক, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক উপনিষদ্ একে একে সবই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহু যত্ন—সংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পাপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুলসম্।

“না, চিড়িয়া নাচিবে না। তুই এখন তোর গল্প বল্।”

দলনী বেগম, এই বলিয়া, যে ময়ূরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল। আপনার হস্তের হীরকজড়িত বলয় খুলিয়া আর একটা ময়ূরের গলায় পরাইয়া দিল; একটা মুখরা কাকাতুয়ার মুখে চোখে গোলাবের পিচকারী দিল। কাকাতুয়া "বাঁদী" বলিয়া গাল দিল। এ গালি দলনী স্বয়ং কাকাতুয়াকে শিখাইয়াছিল।

নিকটে একজন পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, "এখন তোর গল্প বল্।"

কুলসম্ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার বোঝাই দুইখানা কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে একজন ইংরেজ চড়ন্দার। সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি হিব্রাহিম খাঁ বলেন যে নৌকা ছাড়িয়া দাও। উহা আটক করিলেই খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে। গুরগন খাঁ বলেন, লড়াই বাধে বাধুক। নৌকা ছাড়িব না।"

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?

কু। অজিমাবাদের * কুঠিতে যাইতেছে। লড়াই বাধে ত আগে সেইখানে বাধিবে। সেখান হইতে ইংরেজেরা হঠাৎ বেদখল না হয় বলিয়া সেথা হাতিয়ার পাঠাইতেছে। এই কথা ত কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র।

দ। তা গুরগন খাঁ আটক করিতে চাহে কেন?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে। আলি হিব্রাহিম খাঁ বলেন যে, আমরা যতই করি না কেন, ইংরেজকে লড়াইয়ে কখন জিতিতে পারিব না। অতএব আমাদের লড়াই না করাই স্থির। তবে নৌকা আটক করিয়া কেন লড়াই বাধাই? ফলে সে সত্য কথা। ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই। বুঝি নবাব সেরাজউদ্দৌলার কাণ্ড আবার ঘটে!

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল। পরে কহিল, "কুলসম্, তুই একটা দুঃসাহসের কাজ করতে পারিস?"

কু। কি? ইলিস মাছ খেতে হবে, না ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে?

দ। দূর। তামাসা নহে। টের পেলে পর আলিজা তোকে আমাকে হাতীর দুই পায়ের তলে ফেলে দিবেন।

কু। টের পেলে ত? এত অভর গোলাপ সোনা রূপা চুরি করিলাম, কই কেহ ত টের পেলে না! আমার মনে বোধ হয়, পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কোন্ পুরুষে মেয়ে মানুষের চাতুরী কখন টের পাইল, এমন ত দেখিলাম না।

দ। দূর! আমি খোজা খানসামাদের কথা বলি না। নবাব আলিজা অন্য পুরুষের মত নহেন। তিনি না জানিতে পারেন কি?

কু। আমি না লুকাইতে পারি কি? কি করিতে হইবে?

দ। একবার গুরগন খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুলসম বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিস্?

কু। পত্র কে দিবে? দ। আমি।

কু। সে কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ? দ। প্রায়।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ময়ূর দুইটা আপন আপন বাসযষ্টিতে আরোহণ করিল। কাকাতুয়া অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল অন্যান্য পক্ষীরা আহারে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে কুলসম্ বলিল, "কাজ অতি সামান্য। একজন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিয়া আসিবে। কিন্তু এ কাজ বড় শক্ত। নবাব জানিতে পারিলে উভয়ে মরিব। যা হোক, তোমাদের কর্ম্ম তুমি জান। আমি দাসী। পত্র দাও—আর কিছু নগদ দাও।"

পরে কুলসম্ পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গুরগন্ খাঁ।

যাহার কাছে দলনীর পত্র গেল, তাহার নাম গুরগন খাঁ

এই সময় বাঙ্গালার যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুরগন্ খাঁ একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তিনি জাতিতে আরমাণি; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাসেমের এমন ভরসা ছিল যে, তিনি গুরগন্ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুরগন্ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাসেম কোন কর্ম্ম করিতেন না। তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে, মীরকাসেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুরগন্ খাঁ একটী ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুরগন্ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপালোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন। সেগুলি কলিকাতাস্থ কয়েকজন আরমাণির পত্র। পত্র পাঠ করিয়া গুরগন্ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপদার আসিয়া দাঁড়াইল, গুরগন্ খাঁ কহিলেন, "সব দ্বার খোলা আছে?"

চোপদার কহিল, "আছে।"

গুর। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে। এ কথা বুঝাইয়া দিয়াছ?" চোপদার কহিল, "হুকুম তামিল হইয়াছে।"

গুর। আচ্ছা, তুমি তফাতে থাক।

তখন গুরগন্ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্ত স্থানে লুক্কায়িত করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখন কোন পথে

যাই ? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্র বিশেষ—যে যত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গণিলে কি হইবে ? দেখ, আমি গন্ধে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষ অস্থির ; আমিই বাঙ্গালার কর্ত্তা। আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা ? কে কর্ত্তা ? কর্ত্তা ইংরেজ ব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাসেম ; আমি মীরকাসেমের গোলাম। আমি কর্ত্তার গোলামের গোলাম ! বড় উচ্চপদ ! আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা না হই কেন ? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে ? ইংরেজ ! একবার পেলে হয়। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে, আমি কর্ত্তা হইতে পারিব না। আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি—মীরকাসেমকে গ্রাহ্য করি না—যে দিন মনে করিব, সেই দিন উহাকে মসনদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব। সে কেবল আমার উচ্চপদে আরোহণের সোপান—এখন ছাদে উঠিয়াছি—মই ফেলিয়া দিতে পারি ; কণ্টক কেবল পাপ ইংরেজ। তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে। আমি তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত হইবে না। অতএব আমি তাদের তাড়াইব। এখন মীরকাসেম মসনদে থাক্ ; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ। কিন্তু আজ হঠাৎ এ পত্র পাইলাম কেন ? এ বালিকা এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন ?

বলিতে বলিতে যাঁহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গুর্গণ খাঁ তাহাকে পৃথক্ আসনে বসাইলেন। সে দলনী বেগম।

গুর্গণ খাঁ বলিলেন, "আজি অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা অবধি আর তোমাকে দেখি নাই। কিন্তু তুমি এ দুঃসাহসিক কর্ম্ম কেন করিলে ?"

দলনী বলিল, "দুঃসাহসিক কিসে ?"

গুর্গন্ খাঁ কহিল, "তুমি নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিলে, তোমাকে আমাকে—দুই জনকেই বধ করিবেন।"

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে রাগ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।

গুর্। তুমি বালিকা, তাই এমন ভরসা করিতেছ! এত দিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ করি নাই। তুমি যে আমাকে চেন, বা আমি যে তোমাকে চিনি, এ কথা এ পর্য্যন্ত আমরা কেহই প্রকাশ করি নাই—এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে? বলিবে, এ কেবল বাঁচিবার উপায়। তুমি আসিয়া ভাল কর নাই।

দ। নবাব জানিবার সম্ভাবনা কি? পাহারাওয়ালা সকল আপনার আজ্ঞাকারী—আপনার প্রদত্ত নিদর্শন দেখিয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে, এ কথা কি সত্য?

গুর্। এ কথা কি তুমি দুর্গে বসিয়া শুনিতে পাও না?

দ। পাই। কেল্লার মধ্যে রাষ্ট যে, ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত। এবং আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। কেন?

গুর্। তুমি বালিকা, তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?

দ। আমি বালিকার মত কথা কহিতেছি? না বালিকার ন্যায় কাজ করিয়া থাকি? আমাকে যেখানে আত্মসহায় স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে বালিকা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে?

গুর্। হউক। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ তোমার আমার ক্ষতি কি? হয়, হউক না।

দ। আপনারা কি জয়ী হইতে পারিবেন?

গুর্। আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।

দ। এ পর্য্যন্ত ইংরেজকে কে জিতিয়াছে?

গুর্। ইংরেজেরা কয়জন গুরগন্ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে?

দ। সেরাজউদ্দৌলা তাহাই মনে করিয়াছিলেন। যাক্—আমি স্ত্রীলোক, আমার মন যাহা বুঝে, আমি তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হইতেছে যে, কোন মতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না। এ যুদ্ধে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না।

গুর। এ সকল কর্ম্মে স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।

দ। "আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে হইবে। আমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি।" বলিয়া দলনী রোদন করিতে লাগিল।

গুরগন্ খাঁ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীরকাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীরকাসেম আমার স্বামী?"

গুরগন্ খাঁ কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে, তুমি এক দিন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে।"

দলনী ক্রোধে কম্পিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া, উঠিল। গলদশ্রু নিরুদ্ধ করিয়, লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল, "তুমি নিপাত যাও! অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম আছে, তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই; নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুসম্বন্ধ। আমি জানিব যে, তুমিই আমার পরম শত্রু। তুমিও জানিও, আমি তোমার পরম শত্রু। এই রাজান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

দলনী বাহির হইলে গুর্‌গন্ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, দলনী আর এক্ষণে তাঁহার নহে, সে মীরকাসেমের হইয়াছে। ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে স্নেহ করিলে করিতে পারে, কিন্তু সে মীরকাসেমের প্রতি অধিকতর স্নেহবতী। ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী বলিয়া যখন বুঝিয়াছে বা বুঝিবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে। অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গুর্‌গন্ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুর্‌গন্ খাঁ তাহার দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেয়।

অশ্ব বোহণে দূত আগে দুর্গদ্বারে পৌঁছিল। দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে, ছিন্নবল্লীবৎ, ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন, "ভাই, আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না।"

কুল্‌সম্ বলিল, "ফিরিয়া সেনাপতির গৃহে চল।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গ মধ্যে আমার স্থান হইবে।"

সেই অন্ধকার রাত্রে, রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপর নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবনহিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্র সকল মর্ম্মরিত হইতেছিল! দলনী কাঁদিয়া বলিল, "কুল্‌সম্।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দলনীর কি হইল।

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী, রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুল্‌সম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবেন?"

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক।"

কু। এখানে প্রভাত হইলে আমরা ধরা পড়িব।

দ। তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমি ভয় করিব?

কু। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, তা তুমিই জান। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।

দ। যাহাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা—আমি অন্য বিচার মানি না। না হয় মরিব, ক্ষতি কি?

কু। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে?

দ। এখানে দাঁড়াইয়া ধরা পড়িব—সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, সে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? কু। দরবারে।

দ। প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যাইতে চাই। অন্যত্র আমার যাইবার স্থান নাই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরিবার কালে তাঁহাকে বলিতে পাইব যে, আমি নিরপরাধিনী। বরং চল, আমরা দুর্গদ্বারে গিয়া বসিয়া থাকি—সেইখানে শীঘ্র ধরা পড়িব।

এই সময়ে উভয়ে সভয়ে দেখিল, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষমূর্ত্তি গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা বৃক্ষতলস্থ অন্ধকার মধ্যে গিয়া লুকাইল। পুনশ্চ সভয়ে দেখিল, দীর্ঘাকার পুরুষ গঙ্গার পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই আশ্রয়-বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল। দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটি আরও অন্ধকার মধ্যে লুকাইল।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিল। বলিল, 'এখানে তোমরা কে?' এই কথা বলিয়া সে যেন আপনা আপনি, মৃদুস্বরে বলিল, "আমার মত পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা কে আছে?"

দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের ভয় জন্মিয়াছিল, কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল। কণ্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। কুল্‌সম্ বলিল, "আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে?"

পুরুষ কহিলেন, "আমরা? তোমরা কয় জন?"

কু। আমরা দুইজন মাত্র।

পু। এ রাত্রে এখানে কি করিতেছ?

তখন দলনী বলিল, "আমরা হতভাগিনী—আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে?"

শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, "অতি সামান্য ব্যক্তি কর্তৃক লোকের উপকার হইয়া থাকে. তোমরা যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাক—সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার করিব।"

দ। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য—আপনি কে?

আগন্তুক কহিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।"

দ। আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না। কিন্তু যদি আমাদিগের বিপদ্ শুনিতে চান, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলিবার নহে।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস। এই, বলিয়া তিনি দলনী ও কুলসমকে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন; এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে করাঘাত করিয়া "রামচরণ" বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া, ব্রহ্মচারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী তখন রামচরণকে বলিলেন, "তুমি গিয়া শয়ন কর।" শুনিয়া রামচরণ একবার দলনী ও কুলসমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, রামচরণ সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিল না। ঠাকুরজী, এত রাত্রে দুইজন যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া আসিলেন কেন? এই ভাবনা তাহার প্রবল হইল। ব্রহ্মচারীকে রামচরণ দেবতা মনে করিত—তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়াই জানিত—সে বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল না। শেষে রামচরণ

সিদ্ধান্ত করিল, "বোধ হয়, এই দুইজন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সংযমের প্রবৃত্ত দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন—কি জালা, এ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না!"

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন—স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী মনে মনে ভাবিলেন, 'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।

হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না। ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, "আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে, পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন। পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।"

দ। পত্র লইয়া যাইবে কে? ব্র। আমি পাঠাইয়া দিব।

তখন দলনী কাগজ কলম চাহিলেন। ব্রহ্মচারী রামচরণকে আবার উঠাইলেন। রামচরণ কাগজ কলম ইত্যাদি আনিয়া রাখিয়া গেল। দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী ততক্ষণ বলিতে লাগিলেন, "এ গৃহ আমার নহে; কিন্তু যতক্ষণ না রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই থাকুন কেহ জানিতে পারিবে না, বা কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।"

অগত্যা স্ত্রীলোকেরা তাহা স্বীকার করিল। লিপি সমাপ্ত হইলে দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মচারী লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন।

মুঙ্গেরের যে সকল রাজকর্ম্মচারী হিন্দু, ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহাকে চিনিত। সুতরাং সকল কর্ম্মচারীই তাঁহাকে মানিত।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না; এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।" মুন্সী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না। ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার, পূর্ব্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "কল্য উত্তর আসিবে। কোন প্রকারে অদ্য কালযাপন কর।"

রামচরণ প্রভাতে আসিয়া দেখিল, সহমরণের কোন উদ্যোগ নাই। এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ।

সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত পথ স্বামীর নিকটে শৈবলিনীকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল। কখন "অভাগী," কখনও "পোড়ারমুখী," কখনও "চুলামুখী" ইত্যাদি প্রিয় সম্বোধনে শৈবলিনীকে অভিহিত করিয়া স্বামীর কৌতুক-বর্দ্ধন করিতে করিতে আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তার পর চন্দ্রশেখর আসিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেলেন। তার পর কিছু দিন অমনি অমনি গেল। শৈবলিনীর বা চন্দ্রশেখরের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তখন সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া গহনা পরিতে বসিল।

[৪]

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসি-কন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখনও কখনও শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকেন। শৈবলিনীর বিপৎকালে যে, শ্রীনাথ বেদগ্রামে ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরীই বাড়ীর গৃহিণী। তাঁহার মাতা রুগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য। সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল; তাহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকিত।

সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া অলঙ্কার সন্নিবেশ পূর্ব্বক পিতাকে বলিল, "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব—তাহার বিষয়ে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।" সুন্দরীর পিতা কৃষ্ণকমল চক্রবর্ত্তী কন্যার বশীভূত, একটু আধটু আপত্তি করিয়া সম্মত হইলেন। সুন্দরী, রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেলেন—শ্রীনাথ স্বগৃহে গেলেন।

রূপসীর স্বামী কে? সেই প্রতাপ! শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসীপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে। চন্দ্রশেখর, কাসেম-আলি খাঁর শিক্ষাদাতা; তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্র-শেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন! প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা এবং দেশবিখ্যাত নাম। সুন্দরীর শিবিকা তাঁহার পুরিমধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া, সাদরে গৃহে লইয়া গেল। প্রতাপ আসিয়া শ্যালীকে রহস্যসম্ভাষণ করিলেন।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ, সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুন্দরী বলিলেন, "আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি, বলি শুন।"

এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর নিরুদ্দেশ-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া, প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, "এতদিন আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন?"

সু। কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে?

প্র। কি হইবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।

সু। তুমি উপকার করিবে কি না, তা জানিব কি প্রকারে?

প্র। কেন তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?

সু। জানি। কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড়মানুষ হইলে পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যায়।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন, রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল।

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

যে গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সেই প্রতাপের বাসা।

সুন্দরী কিছুদিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া শৈবলিনীকে গালি দিল। প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে, সুন্দরী রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে, শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা হতভাগিনী আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। একদিন রূপসী বলিল, "তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন?"

সুন্দরী বলিল, "তাঁর মুণ্ডপাত করিব ব'লে—তাঁকে যমের বাড়ী পাঠাব ব'লে—তাঁর মুখে আগুন দিব ব'লে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপসী কহিল, "দিদি তুই বড় কুঁদুলী!
সুন্দরী উত্তর করিল, "সেই জন্য আমার কুঁদুলী হয়েছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরে।

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক সেই জন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

জমিদারের অধ্যক্ষ ইলিস্ সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট্ সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিস্কে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব একজন চতুর কর্ম্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক হইল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে এবং কলিকাতার কৌন্সলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্য্যের জন্য গবর্ণর বান্সিটার্ট ফষ্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন এবং আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ সকল বৃত্তান্ত সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। এজন্য শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গের পাঠাইয়াছিলেন। ফষ্টর পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন।

ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গের আসিয়া তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইলেন, কিন্তু এমন সময়ে গুর্গন খাঁ নৌকা আটক করিলেন। তখন আমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে আমিয়টের সঙ্গে ফষ্টরের এই কথা স্থির হইল যে,

যদি নবাব নৌকা ছাড়িয়া দেন—তবে পরদিন প্রাতে ফষ্টর অন্যের নৌকা ফেলিয়া পাটনায় চলিয়া যাইবেন।

ফষ্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। একখানি দেশী ভড়—আকারে বড় বৃহৎ—আর একখানি বজরা। ভড়ের উপর কয়েকজন নবাবের সিপাহী পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েকজন সিপাহী। এইখানিতে অস্ত্র বোঝাই—এইখানিই গুর্গন খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজরাখানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের উপর একজন "তেলিঙ্গা" নামক ইংরেজদিগের সিপাহী বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পরিষ্কার। বজরার পাহারাওয়ালারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার ঢুলিতেছে। তীরে একটা কসাড় বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া একব্যক্তি তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, সিপাহী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন। প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল "হুকুমদার?" প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়াছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া, বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, একজন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমন সময়ে কসাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজরার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র ভড়ের সিপাহীরা "কিয়া হৈ রে?" বলিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল। নৌকার অপরাপর লোক জাগরিত হইল। ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

এদিকে ফষ্টর বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার "ভৌলিয়া" প্রভৃতি অন্ত-র্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃত দেহ ভাসিতেছে, প্রথমে মনে করিলেন, নবাবের সিপাহীরা থাক-য়াছে—কিন্তু তখনই কসাড়বনের দিকে অগ্নি ধূমরেখা দেখিলেন। আরও দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গের দ্বিতীয় নৌকায় লোক-সকল দূরে কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গাকূলে শত শত বৃক্ষশ্রেণী শ্রেণী অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে কলকলরবে অনন্ত-প্রবাহিণী গঙ্গা ধাবিতা হইতেছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে। পলকমধ্যে ফষ্টর এই সকল দেখিলেন।

কসাড় বনের উপর উর্দ্ধরূপ ধূমরেখা দেখিয়া, ফষ্টর হস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ফষ্টর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বনান্তরালে লুক্কায়িত শত্রু আছে। ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, শত্রু অদৃশ্য থাকিয়া প্রহরীকে নিপাত করিয়াছিল, সে এখনই তাঁহাকেও নিপাত করিতে পারে। কিন্তু তিনি পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, দেশী লোকে ইংরেজকে লক্ষ্য করিবে, এ কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংরেজ হইয়া যে দেশী শত্রুকে ভয় করিবে—তাহার মৃত্যু ভাল। এই ভাবিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া বন্দুক উত্তোলন করিয়াছিলেন—কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে কসাড় বনের ভিতর অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল—আবার বন্দুকের শব্দ হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া, প্রহরীর ন্যায় গঙ্গাস্রোতে মধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেই সময়ে কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া বজরার বন্ধনরজ্জু-সকল কাটিলেন। সেখানে জল অল্প, স্রোতঃ মন্দ বলিয়া নাবিকেরা নঙ্গর ফেলে নাই। কোনরূপেও বহুলুক্ত বলবান প্রতাপের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিল না। প্রতাপ এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

এই ঘটনাগুলি বর্ণনায় যে সময় লাগিয়াছে, তাহার শতাংশ সময় মধ্যেই সে সকল সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রহরী পতন, ফষ্টরের বাহিরে আসা, তাহার পতন এবং প্রতাপের নৌকারোহণ, এই সকলে যে সময় লাগিয়াছিল, ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারাও আসিল।

আসিয়া দেখিল নৌকা প্রতাপের কৌশলে বাহির জলে গিয়াছে। একজন সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিতে আসিল, প্রতাপ একটা লগি তুলিয়া তাহার মস্তকে মারিলেন। সে ফিরিয়া গেল। আর কেহ অগ্রসর হইল না। সেই লগিতে জলতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রতাপ আবার নৌকা ঠেলিলেন। নৌকা ঘুরিয়া গভীর স্রোতোমধ্যে পড়িয়া বেগে পূর্বাভিমুখে ছুটিল।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন "তেলিঙ্গা" সিপাহী নৌকার ছাঁদের উপর জানু পাতিয়া, বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহীর হাতের উপর মারিলেন; তাহার হাত অবশ হইল—বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। ফষ্টরের হস্তচ্যুত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন। এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ী—বোধ হয়, তোমাদের কয়জনকে একেলাই মারিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে কাহাকেও কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক। আর আর সকলে, যেখানে যে আছ, সেই খানে থাক। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।"

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল। ভড়ের উপর হইতে দুই একটা বন্দুক হইল, কিন্তু কাহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে, নক্ষত্রালোকে তাহা কিছু কেহ অবধারিত করিতে না পারাতে সে তখনই নিবারিত হইল।

তখন জন্ত হইতে জন কয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ডিঙ্গীতে উঠিয়া, বজ্‌রা ধরিতে আসিল। প্রতাপ প্রথমে কিছু বলিলেন না। তাহারা নিকটে আসিলে, দুইটি বন্দুকই তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুই জন লোক আহত হইল। অবশিষ্ট লোক ভীত হইয়া, ডিঙ্গী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড় বনে লুক্কায়িত রামচরণ প্রতাপকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া এবং ভড়ের সিপাহীগণ কসাড়বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া, ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বজ্রাঘাত।

সেই নৈশ—গঙ্গাবিচারিণী তরণীমধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিল—শৈবলিনী।

বজ্‌রার মধ্যে দুইটি কামরা—একটীতে ফষ্টর ছিলেন, আর একটীতে শৈবলিনী এবং তাহার দাসী, শৈবলিনী এখনও বিবি সাজে নাই—পরণে কালাপেড়ে শাড়ী, হাতে বালা, পায়ে মল—সঙ্গে সেই পুরন্দপুরের দাসী পার্ব্বতী। শৈবলিনী নিদ্রিতা ছিল—শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—সেই ভীমা পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শপ্রার্থিশাখাবাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক স্বর্ণনির্ম্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন ফষ্টরের মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চায়, কিন্তু চরণ মৃণাল হইয়া জলতলে বদ্ধ হইয়াছে

—তাহার প্রতিশব্দ হইত। এদিকে শূকর বলিতেছে, "আমার কাছে আইস, আমি হাঁস ধরিয়া দিব।" প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পড়িবার শব্দ শুনিল। অসম্পূর্ণ—ভগ্ন নিদ্রার আবেশে কিছুকাল বুঝিতে পারিল না। সেই রাজহংস—সেই শূকর মনে পড়িতে লাগিল। যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল এবং বড় গণ্ডগোল উঠিল, তখন তাহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরের কামরায় আসিয়া দ্বার হইতে একবার দেখিল—কিছু বুঝিতে পারিল না। আবার ভিতরে আসিল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। পার্ব্বতীও উঠিয়াছিল। শৈবলিনী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে—সাহেবকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমাদেরই পাপের ফল।

শৈ। সাহেবকে মারিয়াছে, তাতে আমাদের পাপের ফল কি? সাহেবেরই পাপের ফল।

পা। ডাকাত পড়িয়াছে—বিপদ আমাদেরই।

শৈ। কি বিপদ্? এক ডাকাতের সঙ্গে ছিলাম, না হয় আর এক ডাকাতের সঙ্গে যাইব। যদি গোরা ডাকাতের হাত এড়াইয়া কালা ডাকাতের হাতে পড়ি, তবে মন্দ কি!

এই বলিয়া শৈবলিনী ক্ষুদ্র মস্তক হইতে পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত বেণী আন্দোলিত করিয়া, একটু হাসিয়া, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর গিয়া বসিল। পার্ব্বতী বলিল, "এ সময়ে তোমার হাসি আমার সহ্য হয় না।

শৈবলিনী বলিল, "অসহ্য হয়, গঙ্গায় জল আছে, ডুবিয়া মর। আমার হাসির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি হাসিব। একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা-পড়া করি।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিল, "ডাকিতে হইবে না; তাহারা আপনারাই আসিবে।"

কিন্তু চারিদণ্ডকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না। শৈবলিনী তখন দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমাদের

কি কপাল! ডাকাতেরাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না?" পার্ব্বতী কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া, এক চরে লাগিল। নৌকা সেইখানে কিছুক্ষণ লাগিয়া রহিল। পরে, তথায় কয়েকজন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথমে সে পার্ব্বতীর মুখপ্রতি চাহিয়া শেষে শৈবলিনীকে দেখিল। শৈবলিনীকে বলিল, "আপনি নামুন।"

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে,—কোথায় যাইব?" রামচরণ বলিল, 'আমি আপনার চাকর। কোন চিন্তা নাই—আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।"

শৈবলিনী নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণের সঙ্গে আসিল। রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামিল। পার্ব্বতী সঙ্গে যাইতেছিল—রামচরণ তাহাকে নিষেধ করিল। পার্ব্বতী ভয়ে নৌকার মধ্যেই রহিল, রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ় হইলেন। রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখনও দলনী এবং কুল্‌সম্ সেই গৃহে বাস করিতেছিল। তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া, যেখানে তাহারা ছিল, সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না। উপরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?" রামচরণ সে কথা কাণে তুলিল না।

রামচরণ আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া, শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল, প্রতাপের সেরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যে, "পাল্কী জগৎশেঠের গৃহে

লইয়া যাইও।” রামচরণ পথে ভাবিল—“এ রাত্রে জগৎশেঠের ফটক খোলা পাইব কিনা? দ্বারবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কি না? জিজ্ঞাসিলে কি পরিচয় দিব? পরিচয় দিয়া কি আমি খুনে বলিয়া ধরা পড়িব? সে সকলে কাজ নাই; এখন বাসায় যাওয়াই ভাল।” এই ভাবিয়া সে পাল্কী বাসায় আনিল।

এদিকে প্রতাপ পাল্কী চলিয়া গেল দেখিয়া, নৌকা হইতে নামিলেন। পূর্ব্বেই সকলে তাঁহার হাতের বন্দুক দেখিয়া, নিস্তব্ধ হইয়াছিল—এখন তাঁহার লাঠিয়াল সহায় দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আত্মগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, “এখনও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাও। ডাকিয়া লইয়া আইস।”

রামচরণ আসিয়া দেখিল,—লোকে শুনিয়া বিস্মিত হইবে—শৈবলিনী নিদ্রা যাইতেছেন। এ অবস্থায় নিদ্রা সম্ভবে না। সম্ভবে কি না, তাহা আমরা জানি না—আমরা, যেমন ঘটিয়াছে, তেমনই লিখিতেছি। রামচরণ শৈবলিনীকে জাগরিত না করিয়া প্রতাপের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “তিনি ঘুমাইতেছেন—ঘুম ভাঙ্গাইব কি?” শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইলেন—মনে মনে বলিলেন, চাণক্য পণ্ডিত লিখিতে ভুলিয়াছেন; নিদ্রা স্ত্রীলোকের ষোলগুণ। প্রকাশ্যে বলিলেন, “এত পীড়াপীড়িতে প্রয়োজন নাই। তুমিও ঘুমাও—পরিশ্রমের এক শেষ হইয়াছে। আমিও এখন একটু বিশ্রাম করিব।”

রামচরণ শয়ন করিতে গেল। তখনও কিছু রাত্রি আছে। গৃহ—গৃহের বাহিরে নগরী—সর্ব্বত্র শব্দহীন, অন্ধকার। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শয়নকক্ষাভিমুখে চলিলেন, পালঙ্কে শয়না শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেত-ধারি বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল-শ্বেত পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির-শোভা! দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে তাঁহার চক্ষু ফিরিল না, এমন নহে—কেমন অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী নিদ্রা যান নাই—চক্ষু মুদিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন। চক্ষু নিমীলিত দেখিয়া, রামচরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, শৈবলিনী নিদ্রিতা। গাঢ় চিন্তা বশতঃ প্রতাপের প্রথম প্রবেশের পদধ্বনি শৈবলিনী শুনিতে পান নাই। প্রতাপ বন্দুকটি হাতে করিয়া উপরে আসিয়াছিলেন। এখন বন্দুকটি দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। কিছু অন্য মনা হইয়াছিল—সাবধানে বন্দুকটি রাখা হয় নাই; বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এ কি এ?"

এই বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। প্রতাপ জল আনিয়া, মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—সে মুখ শিশির-নিষিক্ত-পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল, কেশগুচ্ছ-সকল আর্দ্র করিয়া, কেশগুচ্ছ সকল ঋজু করিয়া, ঝরিতে লাগিল—কেশ, পদ্মাবলম্ব শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।

অচিরাৎ শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। প্রতাপ দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিলেন, "কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈ। একবার নৌকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কণ্ঠ কাণে প্রবেশ করিল। কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, সে ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণে ভ্রান্তি মনে করিলাম।

এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরা হইয়াছেন দেখিয়া, প্রতাপ বিনাবাক্যব্যয়ে গমনোন্মত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, "যাইও না।"

প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী বস্তুতঃ সুস্থিরা হন নাই। হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল; তাঁহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি আর একটু নীরব থাকিয়া, ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া পুনরপি বলিলেন, "আমাকে এখানে কে আনিল?"

প্র। আমরাই আনিয়াছি। শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?"

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীতভাবে প্রায় বাষ্পগদগদ হইয়া বলিলেন, "যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেই স্থানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।"

প্রতাপ অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।"

শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল—"আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক—তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কহা হ'তে? তোম হ'তে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ-সুপথ-জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

প্রতাপ বলিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমায় দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম, ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম, ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি। নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

শুনিয়া প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন্‌।

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা সিপাহী প্রতাপের আঘাতে অবসন্নহস্ত হইয়া ছাদের উপরে বসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল; উঠিয়া, যে পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে, সেই পথে চলিল। অতিদূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম বকাউল্লা খাঁ। ক্লাইবের সঙ্গে প্রথমে যে সেনা বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাহারা মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া, ইংরেজদিগের দেশী সৈনিকগণকে তখন বাঙ্গলাতে তেলিঙ্গা বলিত। কিন্তু এক্ষণে অনেক হিন্দুস্থানী হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজ সেনাভুক্ত হইয়াছিল। বকাউল্লার নিবাস গাজিপুরের নিকট।

বকাউল্লার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্য থাকিয়া প্রতাপের বাসা পর্য্যন্ত আসিল। দেখিল যে, শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা তখন আমিয়ট্‌ সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। বজ্‌রার বৃত্তান্ত আমিয়ট্‌ সকল শুনিয়াছেন। শুনিল, আমিয়ট্‌ সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্যরাত্রেই অত্যাচারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট্‌ সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট্‌ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল,—বলিল যে, "আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।" আমিয়ট্‌ সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল—কুঞ্চিতভ্রূ ঋজু হইল—তিনি চারিজন সিপাহী এবং একজন নাএককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। বলিলেন যে, দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস। বকাউল্লা কহিল, "তবে দুইজন ইংরেজ সঙ্গে দিউন—প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ সয়তান—এ দেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।"

গলষ্টন্ ও জন্সন্ নামক দুইজন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন।

গমনকালে গলষ্টন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সে বাড়ীর মধ্যে কখনও গিয়াছিলে?" বকাউল্লা বলিল, "না।"

গলষ্টন্ জন্সন্‌কে বলিলেন, "তবে বাতি ও দেশলাই লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ হইবে।"

জন্সন্ পকেটে বাতি ও দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা তখন, ইংরেজদিগের রণযাত্রার গভীর পদবিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন। কেহ কথা কহিল না। পশ্চাৎ পশ্চাৎ চারিজন সিপাহী, নাএক ও বকাউল্লা চলিল। নগরপ্রহরিগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গলষ্টন্ ও জন্সন্ সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে নিঃশব্দে আসিয়া, দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল।

রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য। পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে, সুশিক্ষিত-হস্ত। বস্ত্রকুঞ্চনে, অঙ্গরাগকরণে, বড় পটু। রামচরণের মত ফরাশ নাই—তাহার মত দ্রব্যক্রেতা দুর্লভ। কিন্তু এ সকল সামান্য গুণ। রামচরণ লাঠিবাজিতে মুরশিদাবাদ প্রদেশে প্রসিদ্ধ—অনেক হিন্দু ও যবন তাহার হস্তের গুণে ধরাশয়ন করিয়াছিল। বন্দুকে রামচরণ কেমন অভ্রান্তলক্ষ্য এবং ক্ষিপ্রহস্ত, তাহার পরিচয় ফষ্টরের শোণিতে গঙ্গাজলে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটা সময়োপযোগী গুণ ছিল—ধূর্ত্ততা। রামচরণ শৃগালের মত ধূর্ত্ত। অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী।

রামচরণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, "এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে? ঠাকুর মশাই? বোধ হয়; কিন্তু যা হৌক, একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না।"

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল, দুইজনে অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃত ভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ তাহাকে "হাগুল্

মিণ্ডিল্" বলিত—এখনকার লোক বলে, ইংরেজি। রামচরণ মনে মনে বলিল, "রসো বাবা। দুয়ার খুলি ত বন্দুক হাতে করিয়া —ইণ্ডিল মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শালা।"

রামচরণ আরও ভাবিল, "বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্ত্তাকেও ডাকি।" এই ভাবিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল।

এই সময়ে ইংরেজ দিগের ধৈর্য্য ফুরাইল। জন্‌সন্ বলিল, "অপেক্ষা কেন, লাথি মার ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না।"

গল্‌ষ্টন লাথি মারিল। দ্বার খড়্ খড়্ ছড়্ ছড়্ ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। রামচরণ দৌড়িল। শব্দ প্রাতাপের কানে গেল। প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। সেবার কবাট ভাঙ্গিল না।"

পরে জন্‌সন্ লাথি মারিল। কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

"এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক।" বলিয়া ইংরাজেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী-গণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। রামচরণ চুপি চুপি প্রতাপকে বলিল, "অন্ধকারে লুকাও—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয়, আমবাতের কুঠি থেকে।" রামচরণ অমিয়টের পরিবর্ত্তে আমবাত বলিত।

প্র। ভয় কি? রা। আটজন লোক।

প্র। আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয়জন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের দশা কি হইবে? তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।

রামচরণ যদি ইংরেজদিগের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্‌সন্ জ্বালিতবর্ত্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন। বর্ত্তিকার আলোকে ইংরেজরা দেখিল সিঁড়ির উপর দুইজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জনসন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন এই ?"

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল—সুতরাং ভাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন হস্তের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল যে কেহ তাহার দায় দায়ী। বকাউল্লা বলিল—"হাঁ ইহরাই বটে।"

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া ইংরেজেরা সিঁড়ির উপর উঠিল। সিপাহীরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল দেখিয়া, রামচরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্‌সন্ তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ, চরণে আহত হইয়া, চলিবার শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক এবং পলায়নে রামচরণের যে দশা ঘটিল, তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে স্থির-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কেন আসিয়াছ?"

গল্‌ষ্টন্ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

সে নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজ্‌রার উপর বন্দুক হাতে প্রতাপ গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়।" বকাউল্লা বলিল—"জুনাব্, এই ব্যক্তি সরদার।"

জন্‌সন্, প্রতাপের এক হাত ধরিল, গল্‌ষ্টন্ আর এক হাত ধরিল। প্রতাপ দেখিলেন; বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। একজনের হাতে হাতকড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গল্‌ষ্টন্ পতিত রামচরণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা?" জন্‌সন্ দুইজন সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, "উহাকেও লইয়া আইস।" দুইজন সিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্‌সম্ জাগরিত হইয়া মহা ভয় পাইয়াছিল। তাহারা কক্ষদ্বার ঈষন্মাত্র মুক্ত করিয়া এই সকল দেখিতেছিল। সিঁড়ির পাশে তাহাদের শয়ন গৃহ।

যখন ইংরেজেরা প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নামিতেছিলেন, তখন সিপাহীর করস্থ দীপের আলোক অকস্মাৎ ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে

দলনীর নীলমণিপ্রভ চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফষ্টর সাহেবের বিবি!" গল্‌ষ্টন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যও ত! কোথায়?"

বকাউল্লা পূর্ব্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

জন্‌সন্‌ ও গল্‌ষ্টন ঐ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুল্‌সমকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুল্‌সম্‌ মহাভীতা এবং লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিল। শৈবলিনী ও সকল দেখিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাপের বিচিত্র গতি।

যেমন যবনকন্যারা, অন্য দ্বার খুলিয়া, আপনাদিগের শয়নগৃহ হইতে দেখিতেছিল, শৈবলিনীও সেইরূপ দেখিতেছিল। তিন জনই স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীজাতিসুলভ কুতূহলে তিন জনেই পীড়িতা; তিন জনেই ভয়ে কাতরা। ভয়ের স্বধর্ম্ম ভয়ানক বস্তুর দর্শন পুনঃপুনঃ কামনা করে। শৈবলিনীও আদ্যোপান্ত দেখিল। সকলে চলিয়া গেলে গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শয্যোপরি বসিয়া, শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিল, "এখন কি করি? একা, তাহাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ। সহজই বা কিসে? এতদিন জলে বাস করিলাম, কই একদিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইত, ধীরে ধীরে নৌকার বাহিরে আসিয়া, জলে ঝাঁপ দিলে কে ধরিত? ধরিত—নৌকায় পাহারা থাকিত। কিন্তু আমিও ত কোন উদ্যোগ করি

নাই। মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার কোন উদ্যোগ করি নাই। তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষে মরিতে পারে না। কিন্তু আজ? আজ মরিবার দিন বটে। তবে প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না। প্রতাপের কি হয়? যা হৌক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে, তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম, কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?"

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীর-পার্শ্বে শৈবলিনী স্বহস্তে করবীবৃক্ষ রোপন করিয়াছিল—সেই করবীর সর্ব্বোচ্চ-শাখা প্রাচির অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া, নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখনও তাহাতে বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। তুলসী মঞ্চ—তাহার চারি পার্শ্বে পরিষ্কৃত সুমার্জ্জিত ভূমি, গৃহপালিত মার্জ্জার, পিঞ্জরে স্ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চ বৃক্ষ—সকল স্মরণপটে চিত্রিত হইতে লাগিল। কত কি মনে পড়িল! কত সুন্দর, সুনীল, মেঘশূন্য আকাশ শৈবলিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন; কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবল কুসুম পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া, চন্দ্রশেখরের পূজার জন্য পুষ্পপাত্র ভরিয়া রাখিয়া দিতেন; কত স্নিগ্ধ, মন্দ, সুগন্ধী বায়ু, ভীমাতটে সেবন করিতেন জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে স্ফাটিক নিক্ষেপ দেখিতেন, তাহার তীরে কত কোকিল ডাকিত শৈবলিনী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "মনে করিয়াছিলাম, গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব মনে করিয়াছিলাম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব—প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট কুঠির বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষ-জাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষিকে ধরিব। সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব—গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটাইয়া

পড়িব। আমি পিঞ্জরের পাখী সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না। জানিতাম না যে, মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে; জানিতাম না যে, ইংরেজের পিঞ্জর লোহার পিঞ্জর—আমার সাধ্য কি ভাঙ্গি। অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।” পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর এ কথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে এ কথা বুঝিবে; একদিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে, আমরা এ পাপ চিত্রের অবতারণা করিতাম না। পরে সে ভাবিতে লাগিল, “পরকাল? সে ত যে দিন প্রতাপকে দেখিয়াছি, সেই দিন গিয়াছে। যিনি অন্তর্যামী, তিনি সেই দিনেই আমার কপালে নরক লিখিয়াছেন। ইহকালেও আমার নরক হইয়াছে—আমার মনই নরক—নহিলে এত দুঃখ পাইলাম কেন? নহিলে দুই চক্ষের বিষ ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এতকাল বেড়াইলাম কেন? শুধু কি তাই, বোধ হয়, যাহা কিছু আমার ভাল, তাহাতেই অগ্নি লাগে। বোধ হয়, আমারই জন্য প্রতাপ এই বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে;—আমি কেন মরিলাম না।”

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিল, অধর দংশন করিল; ক্ষণকাল জন্য তাহার প্রফুল্ল রাজীবতুল্য মুখ, রুষ্ট সর্পের চক্রের ভীমকান্তি শোভা ধারণ করিল। সে আবার বলিল, “মরিলাম না কেন?” শৈবলিনী সহসা কটি হইতে একটা “গেঁজে” বাহির করিল। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছুরিকা ছিল। শৈবলিনী ছুরিকা গ্রহণ করিল। তাহার ফলক নিষ্কোষিত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তৎসহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বলিল, “বৃথা কি এ ছুরি গ্রহণ করিয়াছিলাম? কেন এতদিন এ ছুরি আমার এ পোড়া বুকে বসাই নাই? কেন,—কেবল আশায় মজিয়া। এখন?” এই বলিয়া শৈবলিনী ছুরিকাভাগ হৃদয়ে স্থাপিত করিল। ছুরি সেইভাবে রহিল। শৈবলিনী ভাবিতে লাগিল, “আর একদিন ছুরি এইরূপে নিদ্রিত ফষ্টরের বুকের উপর ধরিয়াছিলাম। সে দিন তাহাকে মারি নাই, সাহস

হয় নাই ; আজিও আত্মহত্যায় সাহস হইতেছে না। এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল—সে বুঝিয়াছিল যে, সে আমার কামরায় প্রবেশ করিলে, এই ছুরিতে হয় সে মরিবে, নয় আমি মরিব। দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল, আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না। মরিব ? না, আজ নহে। মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তার পর মরিব।—আর তিনি আর যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব ? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে ? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন ? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই—কখনও ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটা কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে সে কথার আর সাক্ষী কে ? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?"

শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া, সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল। প্রভাতকালে তাহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল। দেখিল, চন্দ্রশেখর !

তৃতীয় খণ্ড।

পুণ্যের স্পর্শ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রমানন্দ স্বামী।

মুঙ্গেরের এক মঠে এক জন পরমহংস কিয়দ্দিবস বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম রমানন্দ স্বামী। সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীতভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শনবিজ্ঞান সকল তিনিই জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, "শুন, বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, দুঃখ বলিয়া একটা সতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর তবে যাহারা পুণ্যাত্মা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন; শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নল রাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন। দেখাইলেন, সার্ব্বভৌম মহাপুণ্যাত্মা রাজগণ চিরদুঃখী—কদাচিৎ সুখী। পরে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন —দেখাইলেন, তাঁহারাও দুঃখী। দানবপীড়িত, অভিশপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, সুরলোকও দুঃখপূর্ণ। শেষে, মনোমোহিনী বাক্‌শক্তির দৈবাবতরণা করিয়া, অনন্ত অপরিজ্ঞেয় বিধাতৃহৃদয়মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখাইলেন যে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারে অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয়মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভূত করিয়াও দুঃখিত হন না? তবে দয়া কিসে? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ

না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়? তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্ত কাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন। যদি বল, তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার দুঃখ কি? উত্তর এই যে, যিনি নির্ব্বিকার, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারে স্পৃহাশূন্য - তাঁহাকে স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া মানি না। যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিতে পারি না—তিনি দুঃখময়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কেন না, তিনি নিত্যানন্দ। অতএব, দুঃখ বলিয়া কিছু নাই, ইহাই সিদ্ধ।"

রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই; তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহ সৃষ্টির দুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখ-নিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখেরও নিবারণ হয়। দেবগণ জীব-দুঃখনিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদি-বিকারশূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই।" পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা কীর্ত্তন করিয়া ভীষ্মাদি বীরগণের পরোপকারিতার বর্ণন করিলেন। দেখাইলেন, যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে। তখন রমানন্দ স্বামী শতমুখে পরোপকার-ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণেতিহাস প্রভৃতি মন্থন করিয়া, অনর্গল ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রযুক্ত করিতে লাগিলেন। শব্দসাগর মন্থন করিয়া শত শত মহার্থ শ্রবণমনোহর, বাক্যপরম্পরা কুসুম-মালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন, সাহিত্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা কবিতানিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিতা করিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠনির্গত, উচ্চারণকৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব্ব বাক্য সকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে তূর্য্যনাদবৎধ্বনিত হইতে লাগিল। সে বাক্য সকল কখনও মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখনও বীণানিক্কণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন "গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।"

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন পরিচয়।

এ দিকে ব্রহ্মচারিদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেঁছ হইল। নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছেন। তাঁহাকে কুলসম্‌কে লইয়া যাইবার জন্য, প্রতাপ রায়ের বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল।

তখন বেলা হইয়াছে। তখন সে গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।

শৈবলিনী শুনিলেন, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। কবিগণ আশার প্রশংসায় মুগ্ধ হন। আশা সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায়। কেবল, সৎকার্য্য কোন আশায় কৃত হয় না। যাঁহারা স্বর্গের আশায় সৎকার্য্য করেন, তাঁহাদের কার্য্যকে সৎকার্য্য বলিতে পারি না। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী, আপত্তি না করিয়া, শিবিকারোহণ করিলেন।

খোজা, শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া, অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত দলনী নহে। আরও দেখিলেন, দলনীও এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী নহে। আরও দেখিলেন যে, এরূপ লোকবিমোহিনী তাঁহার অন্তঃপুরে কেহই নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শৈ। আমি ব্রাহ্মণকন্যা। ন। তুমি আসিলে কেন?

শৈ। রাজভৃত্যগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন?

শৈ। তিনি সেখানে নাই। ন। তিনি তবে কোথায়?

যখন গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌, দলনী ও কুল্‌সম্‌কে প্রতাপের গৃহ হইতে লইয়া যায়, শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিল। তাঁহারা কে, তাহা সে জানিত না। মনে করিয়াছিল, চাকরাণী বা নর্ত্তকী। কিন্তু যখন নবাবের ভৃত্য তাঁহাকে বলিল যে, নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল, এবং তাহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখনই শৈবলিনী বুঝিয়াছিল যে, বেগমকে ইংরেজেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী ভাবিতেছিল।

নবাব শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাহাকে দেখিয়াছ?"

শৈ। দেখিয়াছি। ন। কোথায় দেখিলে?

শৈ। যেখানে আমরা কাল রাত্রে ছিলাম।

ন। সে কোথায়? প্রতাপ রায়ের বাসায়? শৈ। আজ্ঞা হাঁ।

ন। বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন, জান?

শৈ। দুইজন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। কি বলিলে?

শৈবলিনী পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তর পুনরুক্ত করিল। নবাব মৌনী হইয়া রহিলেন। অধর দংশন করিয়া শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন। গুর্‌গন্‌ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ইংরেজ বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল, জান?

শৈ। না।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল?

শৈ। তাঁহাকেও উহারা সেই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। তাহার বাসায় আর কোন লোক ছিল?

শৈ। একজন চাকর ছিল, তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, জান?"

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিল, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিল। বলিল, "না।"

ন। প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারে চাকরী করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয়? শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি? শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিল। পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিল।

নবাব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।"

শৈবলিনী বলিল, "আমার গৃহ কোথা—কোথা যাইব?"

নবাব নিস্তব্ধ হইলেন। পরক্ষণে বলিলেন, "তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

শৈ। আমার স্বামীর কাছে। আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিন। আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ করিতেছি;—আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; হয়, আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন, নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা করিয়া, ইহার উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মরিব। সেই জন্য এখানে আসিয়াছি।

সংবাদ আসিল. গুরগন্ খাঁ হাজির। নবাব, শৈবলিনীকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন সখ।

নবাব গুরগন্ খাঁকে, অন্যান্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, কহিলেন, "ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমার

বিবেচনায় বিবাদের পূর্ব্বে আমিয়ট্‌কে অবরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, কেন না, আমিয়ট্‌ আমার পরম শত্রু। কি বল?

গুর্‌গন্‌ খাঁ কহিলেন, "যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয়। দূতের পীড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে — আর—"

নবাব। অমিয়ট্‌ কাল রাত্রে এই সহরমধ্যে এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ করে, সে দূত হইলেও, আমি কেন তাহার দণ্ডবিধান না করিব?

গুর্‌। যদি সে এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য। কিন্তু তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব?

নবাব। এখনই তাহার বাসস্থানে সিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও। তাহাকে সদলে ধরিয়া লইয়া আসুক।

গুর্‌। তাহারা এ সহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে। নবাব। সে কি! বিনা এত্তেলায়?

গুর্‌। এত্তেলা দিবার জন্য হে নামক একজনকে রাখিয়া গিয়াছে।

নবাব। এরূপ হঠাৎ, বিনা অনুমতিতে, পলায়নের কারণ কি? ইহাতে আমার সহিত অসৌজন্য হইল, তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর্‌। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকার চড়ন্দার ইংরেজকে কে কাল রাত্রে খুন করিয়াছে। আমিয়ট্‌ বলে আমাদের লোকে খুন করিয়াছে। সেইজন্য রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কে খুন করিয়াছে শুনিয়াছ?

গুর্‌। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাইলে খেলোয়াৎ দিব। প্রতাপ রায় কোথায়?

গুর্‌। তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে, কি আজিমাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব। এতক্ষণ আমাকে এ সকল সংবাদ দাও নাই কেন?

গুর্। আমি এই মাত্র শুনিলাম।

এ কথাটি মিথ্যা। গুর্গন খাঁ আদ্যোপান্ত সকল জানিতেন, তাঁহার অনভিমতে আমিয়ট্ কদাপি মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গুর্গন্ খাঁর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম, দলনী মুঙ্গেরের বাহির হইলেই ভাল; দ্বিতীয়, আমিয়ট্ একটু হস্তগত থাকা ভাল, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারিবে।

নবাব গুর্গন্ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুর্গন্ খাঁ যখন যান, নবাব তাঁহার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই, "যতদিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, ততদিন তোমায় কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তার পর দলনী বেগমের ঋণ তোমায় শোণিতে পরিশোধ করিব।"

নবাব তাহার পর মীর মুন্সিকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরওয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিয়টের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে এবং তাহার সঙ্গের বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া কলে কৌশলে ধরিতে হইবে, ইহাও লিখিয়া দিও। পরওয়ানা তটপথে বাহকের হাতে যাউক— অগ্রে পঁহুছিবে।

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না। ইংরেজেরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুরশিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে। তুমি এখন—"

শৈবলিনী হাত যোড় করিয়া কহিল, "বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে ধরা যায় না কি?"

নবাব। ইংরেজদিগকে ধরা অল্প লোকের কর্ম্ম নহে। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে, বড় নৌকা চাই। ধরিতে ধরিতে তাহারা মুরশিদাবাদ পৌঁছিবে। বিশেষ যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া কি জানি, যদি ইংরেজেরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে।

মুরশিদাবাদে সুচতুর কর্ম্মচারী সকল আছে, তাহারা কলে কৌশলে ধরিবে।

শৈবলিনী বুঝিল যে, তাহার সুন্দর মুখখানিতে অনেক উপকার হইয়াছে। নবাব তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। নহিলে এত কথা বুঝাইয়া বলিবেন কেন? শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাত যোড় করিল। বলিল, "যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটী ভিক্ষা—মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ—তিনি স্বয়ং বীর পুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না—তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান, তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন, বলিলেন, "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি, তাহা জান না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যদি হুকুম হয়, যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চ হাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিল, বলিল, "প্রভু! না পারি, আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

নবাব শৈবলিনীর কুঞ্চিতভ্রূশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, এ সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন, "মরে মরুক, আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই, নহিলে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্য্যসিদ্ধি করিবে।" শৈবলিনী বলিলেন, "তুমি কি একাই যাইবে?"

শৈ। স্ত্রীলোক, একা যাইতে পারিব না। যদি দয়া করেন, তবে একজন দাসী, একজন রক্ষক, আজ্ঞা করিয়া দিন।

নবাব, চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দিন নামে একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল। নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে লও এবং একজন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও। নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া, এইক্ষণেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর।

মসীবুদ্দিন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে?"

নবাব। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইহাঁকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।

পরে উভয়ে নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া দেখিয়া, সেইরূপ মাটি ছুঁইয়া পিছু হটিয়া সেলাম করিল। নবাব হাসিলেন।

নবাব গমনকালে বলিলেন, "বিবি স্মরণ রাখিও। কখনও যদি মুস্কিলে পড়, তবে মীরকাসেমের কাছে আসিও।"

শৈবলিনী পুনর্ব্বার সেলাম করিল। মনে মনে বলিল, "আসিব বৈ কি? হয় ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।"

মসীবুদ্দিন পরিচারিকা ও নৌকা সংগ্রহ করিল এবং শৈবলিনীর কথামত বন্দুক, গুলি, বারুদ, তরবারি ও ছুরি সংগ্রহ করিল। মসীবুদ্দীন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, এ সকল কি হইবে। মনে মনে করিল যে, এ দোসরা চাঁদ সুলতানা।

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চাঁদ।

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুইপার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে, শ্রী সিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবল ধরিয়াছে;

গঙ্গার জল চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখনও কখনও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত; যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে! নীচে নদী অনন্ত, পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত, তন্মধ্যে তারকামালা অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীর শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

এই তরণীশ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজ্‌রা আছে—তাহার উপরে সিপাহীর পাহারা। সিপাহীদ্বয় গঠিত মূর্ত্তির ন্যায়, বন্দুক স্কন্ধে করিয়া স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিতরে স্নিগ্ধ স্ফটিকদীপের আলোকে নানাবিধ মহার্ঘ্য আসন, শয্যা, চিত্র, পুত্তল প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। ভিতরে কয়জন সাহেব। দুইজনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। একজন সুরাপান করিতেছেন ও পড়িতেছেন। একজন বাদ্যবাদন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

অমিয়ট সাহেব জনসন্‌কে কিস্তি দিতে দিতে বলিলেন "ও কি ও?"

জনসন্ বলিলেন "কার কিস্তি মাত হইয়াছে।"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে; কিন্তু সেই জলভূমির নীরব প্রান্তরমধ্যে এই নিশীথ ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকতভূমির মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকাপ্রান্তরমধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দি ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?"

স্ত্রীলোকটি তাহার হিন্দি কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আমিয়ট পুনঃ পুনঃ তাঁহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা শৈবলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হাসে।

বজ্‌রার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট্‌ গল্‌ষ্টন্‌কে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না। তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

গল্‌ষ্টন্‌ও প্রায় আমিয়টের মত পণ্ডিত; কিন্তু ইংরেজমহলে হিন্দিতে তাঁহার বড় পসার। গল্‌ষ্টন্‌ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

শৈবলিনী কথা কহিলেন না, কাঁদিতে লাগিল।

গ। কেন কাঁদিতেছ?

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিল না—কাঁদিতে লাগিল।

গ। তোমার বাড়ী কোথায়? শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ।

গ। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? শৈবলিনী তদ্রূপ।

গল্‌ষ্টন হারি মানিলেন। কোন কথার উত্তর দিল না, ইংরেজেরা শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনী সে কথা বুঝিল না—নড়িল না—দাঁড়াইয়া রহিল।

আমিয়ট বলিলেন, "এ আমাদিগের কথা বুঝে না—আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক দেখিয়া বোধ হইতেছে, ও বাঙ্গালীর

মেয়ে। একজন বাঙ্গালীকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।”

সাহেবের খান্‌সামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খান্‌সামা জিজ্ঞাসা করিল, “কাঁদিতেছ কেন?”

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিল। খান্‌সামা সাহেবদিগকে বলিল, “পাগল।”

সাহেবেরা বলিলেন, “উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায়?”

খান্‌সামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিল, “ক্ষিদে পেয়েছে।”

খান্‌সামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, “উহাকে কিছু খাইতে দাও।”

খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবুর্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে, কেন না, শৈবলিনী পরমা সুন্দরী। শৈবলিনী কিছুই খাইল না। খানাসামা বলিল, “খাও না।” শৈবলিনী বলিল, “ব্রাহ্মণের মেয়ে। তোমাদের ছোঁওয়া খাব কেন?”

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ কথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, “কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?”

খানাসামা বলিল, “একজন সিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী একজন ব্রাহ্মণ আছে।”

সাহেব বলিলেন, “যদি কাহারও ভাত থাকে, দিতে বল।”

খানাসামা শৈবলিনীকে প্রথমে সিপাহীদের কাছে লইয়া গেল। সিপাহীদের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খানসামা যে নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ কয়েদী, প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পানসীতে একা প্রতাপ। বাহিরে আগে পিছে শাস্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার। খান্‌সামা বলিল, “ওগো ঠাকুর!”

প্রতাপ বলিল, “কেন?”

খা। তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে? প্র। কেন?

খা। একটী ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে। দুটী দিতে পার?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না। বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।" খানসামা সান্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। সান্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খানসামা হুকুম করাইতে গেল। পরের জন্য এত জল বেড়াবেড়ি কে করে? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খানসামা, কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক পরের উপকার করে না। পৃথিবীতে যত প্রকার মনুষ্য আছে, ইংরাজদিগের মুসলমান খানসামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু স্বার্থ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটার খাওয়া দাওয়া হইলে ইহাকে একবার খানসামা মহলে লইয়া গিয়া বসাইব। পীরবক্স শৈবলিনীকে আহার করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রতাপের নৌকায় শৈবলিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—খানসামা হুকুম করাইতে আমিয়ট্ সাহেবের নিকট গেল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র। আমিয়ট্ দেখিয়াছিলেন যে, এই "জেন্টু" স্ত্রীলোকটি নিরুপমা রূপবতী—তাহাতে আবার পাগল শুনিয়া একটু দয়াও হইয়াছিল। আমিয়ট্ জমাদার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। সান্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায়—পলায়ন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। সান্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল—নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না।

শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে, দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ঈষৎ হর্ষ প্রফুল্ল—মুখমণ্ডল স্থিরপ্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে!

শৈবলিনী অতি লঘুস্বরে, কানে কানে বলিল, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল?"

প্রতাপ হাত ধুইল। সেই সময়ে শৈবলিনী কানে কানে বলিল, "এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিল, "আগে তুমি যাও। নচেৎ তুমি বিপদে পড়িবে।"

শৈ। এই বেলা পলাও। হাতকড়ি দিলে আর পলাইতে পারিবে না। এই বেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল। আমি পাগল, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ভাত খাইব না।" তখনই আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

"কি হইল? কি হইল?" বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে করিতে নৌকা হইতে বাহির হইল। সান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ?" এই বলিয়া প্রতাপ সিপাহীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী পানসী হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর" বলিয়া প্রতাপ অপর দিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণ-পটু শৈবলিনী আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

"কয়েদি ভাগিল" বলিয়া পশ্চাতের সান্ত্রী ডাকিল। এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—পলাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে স্ত্রীহত্যা কি প্রকারে দেখিব? তুই বাপু হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস্।" সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্ব্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিল। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। দেখিল যে, যে নৌকায় শৈবলিনী লরেন্স্ ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিল, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিতা হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তাহার ছাদে, জ্যোৎস্নার আলোকে, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর, একটী সাহেব অর্দ্ধশয়নাবস্থায় রহিয়াছে। উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার শব্দ করিল—দেখিল, পালঙ্কে লরেন্স ফষ্টর।

লরেন্স্ ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে চিনিল—শৈবলিনী। লরেন্স্ ফষ্টরও চীৎকার করিয়া বলিল, "পাকড়ো! পাকড়ো? হামারা বিবি!" ফষ্টর শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি পাঁচজন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহারা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! ফষ্টর সাহেব ইনাম্ দেগা।" প্রতাপ মনে মনে বলিল, "ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম্ দিয়াছি—ইচ্ছা আছে, আর একবার দিব।" প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিল, আমি ধরিয়াছি—তোমরা উঠ।"

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফষ্টরের মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অগাধ জলে সাঁতার।

দুই জনে সাঁতারিয়া, অনেকদূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত-দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া ক্ষুদ্রবীচিমালিনী নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকরসাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কালসমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে, আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি!

তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া ত জড়প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না,—তারা তেমনি জলে—তীরে বৃক্ষ তেমনই দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনই খেলে। জড়-প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে! শৈবলিনী নৌকার উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ শ্বেতমুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলীর ন্যায় সাঁতার দিতেছিল। কিন্তু শান্তি নাই। উভয়ে সন্তরণপটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কত কাল পরে! বৎসরে কি কালের

সাপ! তাহাতে আবার কালের সাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সেই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে।—শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ! শৈ। কি? প্র। মনে পড়ে? শৈ। কি!

প্র। আর একদিন এমনই সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। একখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, "ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল। বলিল, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?" শৈবলিনী বলিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না; আজি মরিব। প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব—তোমার হাত।

শৈ। কি চাও, প্রতাপ? যা বল তাই করিব।

প্র। একটী শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীলজল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফষ্টর আসিয়া যেন সম্মুখে তরবারি হস্তে দাঁড়াইল। শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "কি শপথ, প্রতাপ?"

উভয়ে পাশাপাশি কাষ্ঠ ছাড়িয়া সাঁতার দিতেছিল। গঙ্গার কল-কল চল-চল জল-তরঙ্গ-রব-মধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা হইতেছিল। চারিপাশে প্রক্ষিপ্ত বারি-কণা-মধ্যে চন্দ্র হাসিতেছিল জড়-প্রকৃতির দৌরাত্ম্য!

"কি শপথ প্রতাপ?" প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ, শৈ। কাছে আইস—হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া, বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল। দুই জনের সাঁতার দেওয়া ভার হইল। আবার উভয়ে কাষ্ঠ ধরিল।

শৈবলিনী বলিল, "এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কতকাল পরে প্রতাপ?"

প্র। আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল—"তোমার শপথ—কি বলিব?"

প্র। শপথ কর,—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন শুভ অশুভের তুমি দায়ী—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য প্রাণান্তকর; শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল—"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?" প্র। আমি।

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না—আইস তবে দুই জনে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল "তীরে চল।"

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল।

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল। শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ উঠিল।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ, আমি তোমাকে চাহি না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব।

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতিগম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল—"প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ! আজ হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজ হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল; কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল।

প্রতাপ গদগদ-কণ্ঠে বলিল, "চল তীরে উঠি।"

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিল।

পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিল। ছিপ নিকট ছিল। উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল। উভয়ের মধ্যে কেহই জানিত না যে রামানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

এদিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

রূপসীর সঙ্গে মোকদ্দমায় আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হইল।
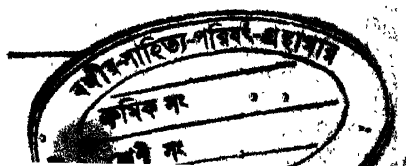
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রামচরণের মুক্তি।

প্রতাপ যদি পলাইল, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রামচরণ ইংরাজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিলনা। তাহারই গুলিতে যে, ফষ্টারের আঘাত ও সাস্ত্রীর নিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। তাহাকে সামান্য ভৃত্য বিবেচনা করিয়া আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রাকালে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমার মুনিব বড় বদ্‌জাত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্ত করে বলিল, "আমি চাষা গোয়ালা—কথা জানি না—রাগ করিবেন না—আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আমিয়টকে কেহ বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

রা। নইলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন?

আমিয়ট। কি তামসা?

রা। আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলার, বুঝায় যে, আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।

দ্বিভাষী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি এক প্রকার এদেশী খোষামোদ। মনে করিলেন, যেমন নেটিবেরা খোষামোদ করিয়া, "মা বাপ" "ভাই" এইরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রামচরণ সেইরূপ খোষামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে। আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি চাও কি?"

রামচরণ বলিল, "আমার পা জোড়া দিয়া দিতে হুকুম হউক।"

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি কিছু দিন আমাদিগের সঙ্গে থাক, ঔষধ দিব।"

রামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ রহিল না।

যে রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিল, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গমনকালে, রামচরণ অস্ফুটস্বরে ইণ্ডিল মিণ্ডিলের পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল। পা জোড়া লাগিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতোপরি।

আজি রাত্রিতে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ;—তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার, তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষরাত্রে, ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া, তীরে লাগিয়াছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটা নিভৃত স্থানে ছিপ লাগিয়াছিল। সেই সময়ে শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এবার শৈবলিনী অস্পদ ভয়প্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ-সৌন্দর্য্য-প্রণয়াদি-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া

থাকিতে পারে! বিক্টর হ্যুগো যে সমুদ্রতলবাসী রাক্ষসজাতীয় ভয়ঙ্কর পুরুভুজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অতি স্বচ্ছ স্ফটিক-নিন্দিত জলমধ্যে বাস করে, ইহার বাসগৃহতলে মৃদুল জ্যোতিঃ-প্রফুল্ল চারু গৈরিকাদি ঈষৎ জ্বলিতে থাকে; ইহার গৃহে কত মহা-মূল্য মুক্তা-প্রবালাদি কিরণ প্রচার করে; কিন্তু ইহা মনুষ্যের শোণিত পান করে; যে ইহার গৃহসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথায় গমন করে, এই শতবাহু রাক্ষস, ক্রমে এক একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরে; ধরিলে আর কেহ ছাড়াইতে পারে না। শত হস্তে সহস্র গ্রন্থিতে জড়াইয়া ধরে; তখন রাক্ষস, শোণিত-শোষক সহস্র মুখ হতভাগ্য মনুষ্যের অঙ্গে স্থাপন করিয়া, তাহার শোণিত-শোষণ করিতে থাকে।

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই, তাহার সন্ধান করিবে। এজন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিল, ততদূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল। গিরি আরোহণ করিলে, পাছে, অনুসন্ধান-প্রবৃত্ত কেহ তাহাকে পায়, এজন্য দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইল না। বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। সমস্ত দিন অনাহারে গেল। সায়াহ্নকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিল। শৈবলিনী অন্ধকারে, গিরি-আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতা গুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কণ্টকে, ভগ্ন শাখাগ্রভাগে বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি-সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া, এ ভীষণ কণ্টকময়, হিংস্রজন্তুপরিবৃত পর্ব্বতারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এতকাল যে ঘোরতর পাপে নিমগ্ন

হইয়াছিল—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন শমতা হইবে?

অতএব ক্ষতবিক্ষতচরণে, শোণিতাক্ত-কলেবরে, ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসা-পীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি-আরোহণ করিতে লাগিল। পথ নাই—লতা গুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার। অতএব শৈবলিনী বহু কষ্টে অদূরমাত্র আরোহণ করিল।

এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্ত বিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া, গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল জগতে প্রস্তর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পর্ব্বতারোহণ-চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিল।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত; বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর! সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ বাত্যা সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। একবিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা। তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। সে গর্জ্জন, বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখা-ভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ-শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনতমস্তকে পার্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষ লতা-গুল্মাদির শাখা সকল বায়ুতাড়িত হইয়া প্রহত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে। শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম-বেগে আসিয়া শৈবলিনীর উরুদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে

তুমি জড়-প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাহাতে কত সুখে যুবক-যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্ব-নাশিনী! কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

অনেক পরে, বৃষ্টি থামিল; ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিল যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। তখন তাহার গার্হস্থ-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতে-ছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্য্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃ পুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছি, অদ্য সে নিকট। এমন সময়ে সেই মনুষ্যশূন্য পর্ব্বতে, সেই অগম্য বন-মধ্যে, সেই মহাঘোর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিল, কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিল। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্যহস্তের

স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয়বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "তুমি কে? দেবতা না মনুষ্য? মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে, কেন না, দেবতা দণ্ডবিধাতা।"

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উষ্ণ নিশ্বাসস্পর্শ স্কন্ধদেশে অনুভূত করিল। দেখিল, এক ভুজ শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্র করিয়া বেড়িয়া ধরিল। শৈবলিনী দেখিল, তাহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিল—বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিল যে, এ যেই হউক, লরেন্স ফষ্টর নহে।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রায়শ্চিত্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ কি করিলেন।

প্রতাপ জমিদার এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র। এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া, বোধ হয়, কোন জমিদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশমর্য্যাদায় পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশ-

মর্য্যাদার বিশেষ গর্ব্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা রুশ্মানু বা স্কন্দ-নেবিয়া নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্য্যাদা ছিল তাঁহারা গো চোর; বিরাটের উত্তরগোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালি জমিদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশমর্য্যাদা আছে।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমীদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তিরক্ষার জন্য বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না; এমন কি, দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাত্রি প্রভাতে প্রতাপ, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া, তাহাকে না দেখিয়া, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি? আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্মপথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে, তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈব-

লিনীকে পুত্রবধূ বন্দী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসংস্কার করিতে হইবে; নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে; দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য; কেন না, ইঁহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গেরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ দুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না?

তার পর মনে ভাবিলেন, যাহার যেমন শক্তি, তাহার কর্ত্তব্য এ কার্য্যে নবাবের সাহায্য করে। কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

তারপর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না? আমি কি করিতে পারি?

তার পর মনে ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দস্যু আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য্য হইতে পারে?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুঠপাঠ হইতে পারে। যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের রসদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানে রসদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব ইংরেজের দ্রব্যসামগ্রী যাইতেছে, সেইখানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও, নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ-সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ-বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র। সৈন্যের পুষ্টিরোধ এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যতদূর পারি, ততদূর তাহা করিব।

তার পর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব ? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয় শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে; পঞ্চম, নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই একখানা বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব। অতএব আমি ইহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোষামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশে আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল। কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া, সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইল; কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল; তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন্ মুখে না বলিব ?"

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছেন।

শুনিয়া গুর্‌গন্ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শৈবলিনী কি করিল।

মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—

কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্ব্বতস্থ রন্ধ্র-পথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে?—সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইল। ভয়? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। শৈবলিনীর ভয় নাই—কেন না, জীবন তাহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল—ফেলিতে পারিলেই ভাল। বাকি যাহা—সুখ, ধর্ম্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছিল—আর যাইবে কি? কিসের ভয়?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশা হৃদয়মধ্যে সযত্নে, সঙ্গোপনে পালিত করিয়াছিল, সেই দিন, বা তাহার পূর্ব্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল; যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে; চিত্ত নিতান্ত বিকল নিতান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্ব্বতারোহণশ্রান্তি, বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ; শরীরও নিতান্ত বিকল নিতান্ত বলশূন্য। তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানবচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্দ্ধনিদ্রাভিভূতা অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলখণ্ড সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দুই কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃতি জীবসকল—চর্ম্মমাংসাদিবর্জ্জিত—কেবল অস্থি, ও বৃহৎ, ভীষণ, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়-বিশিষ্ট—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া, সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে

পর্ব্বত হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে মুক্ত করিয়া, সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোকমাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহসূচী-সকল অগ্রভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, "সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্।" শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহারজন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিল যে, সেই বেত্র জ্বলন্ত লোহিত লৌহনির্ম্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর-সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল; রুধির-স্রোত বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধিরস্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার আর সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে, তাহা চক্ষে প্রবেশমাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিষসংযোগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল যে, শৈবলিনী নাসিকা আবৃত

করিয়াও উন্মত্তের ন্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর কর্কশ, ভয়াবহ শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, পর্ব্বতবিদারণ অশনিপতন, শিলাবর্ষণ, জলকল্লোল, অগ্নি-গর্জ্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন, সকলই এককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল—কখনও শীতে শতসহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্নবিছিন্ন করিতে লাগিল! শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, "প্রাণ যায়! রক্ষা কর!" তখন অসহ্য পূতিগন্ধবিশিষ্ট এক বৃহৎ কদর্য্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনী তখন চাৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! এ নরক। এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

মহাকায় পুরুষ বলিলেন, "আছে।" স্বপ্নাবস্থায় অপ্রকৃত চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখন ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিল, "আমার কি হবে! আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে।"

এ কি এ! শৈবলিনী কি সত্য সত্যই নরকে? শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ ভীত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়?"

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।"

এ কি দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, "কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?" উত্তর—আমি শিখাইব।

শৈ। তুমি কে? উত্তর—ব্রত গ্রহণ কর। শৈ। কি করিব?

উত্তর—তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া, আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।

শৈবলিনী হাত বাড়াইল। প্রসারিত হস্তের উপর একখণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি করিব?"

উত্তর—তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈ। বেদগ্রাম সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর—হাঁ, গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিবে।

শৈ। আর? উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে। শৈ। আর?

উত্তর—ফলমূল পত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না। শৈ। আর?

উত্তর—জটাধারণ করিবে। শৈ। আর?

উত্তর—একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপকীর্ত্তন করিবে।

শৈ। আমার পাপ যে বলিবার নয়। আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? উত্তর—আছে। শৈ। কি? উত্তর—মরণ।

শৈ। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইল না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটী কথার উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায়?"

উত্তর—কেন? শৈ। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না?

উত্তর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। দ্বাদশ বৎসর পরে? উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈ। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কতদিন বাঁচিব? যদি দ্বাদশ বৎসরমধ্যে মরিয়া যাই? উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈ। কোন উপায়ে কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ পাইব না? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাতদিন, কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও; তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধানিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না—বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি

করিয়া সরলচিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর; তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাতাস উঠিল।

শৈবলিনী তাহাই করিল—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইল না—কেবল এক একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির হইত। সাতদিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিল না। প্রায় অনশনে সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু স্পর্শ করিতে পায় না। ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ—মন নিরুদ্ধ—সর্ব্বত্র স্বামী। স্বামী চিত্তবৃত্তি-সমূহের একমাত্র অবলম্বন হইল। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না—সাতদিন সাত রাত্র কেবল স্বামিমুখ দেখিল। ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না—কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে পাইল—ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র তাঁহার পুষ্পপাত্রের পুষ্পরাশির গন্ধ পাইতে লাগিল—ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল। আশা আর কিছুতেই নাই—আর কিছুতে ছিল না, স্বামিসন্দর্শন-কামনাতেই রহিল। স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্তললাটপ্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল—কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধিপুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল, সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই। নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত চিত্ত অন্য চিন্তাশূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। এই অবস্থায়, অবসন্ন-শরীরে, অবসন্ন-মনে, একাগ্রচিত্তে, স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর
অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ! এই
দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দরগঠন, সুকুমারে বলময়,
এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত,
চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের
সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি!
সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন—জ্বলিতেছে, হাসিতেছে,
ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ স্থির,
স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে
কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—
কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্র-
শোভিত শালতরু,—মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত,
অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী
আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ
জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন
না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা-
পরিস্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু,
মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরি-
লাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত
মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎতুল্য, দুর্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য,
আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন
মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই এই ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—
অপার অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—
প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গ-
ভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন
হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে
আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান, অক্ষর, অসৎ;
তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে
শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে
আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায়

অবিশ্বাস—তার কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?

যে বলিয়াছিল, এইরূপে স্বামী ধ্যান কর, সে অনন্ত মানব-হৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে।* জানে যে, এই মন্ত্রে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে, এ মন্ত্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটী পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল-মূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে ফল-মূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবস প্রাতে ভাবিল, স্বামিদর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন; শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুন্‌গুন্ করিতেছে।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব। শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামীধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল। সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখনও দেখিল, সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে; অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে, সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প-সকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল। কখনও দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে; আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; অমনি সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নিপর্ব্বতমধ্যে এক গণ্ডূষ জল

নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল। শীতল পবন বহিল, কুণ্ডমধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম-সকল বিকশিত হইল, নদীজলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখনও দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটী পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই ছিন্নশিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফষ্টরের মুখের ন্যায়।

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে, অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন, পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কত গগনবাসী অপ্সরা কিন্নরাদি মেঘতরঙ্গমধ্য হইতে মুখমণ্ডল উত্থিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী স্বর্ণ-মেঘে আরোহণ করিয়া, স্বর্ণকণ্ঠের বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পাপময় দেহস্পৃষ্ট পবনস্পর্শে তাহাদের জ্যোতিঃ নিবিয়া যাইতেছে কত গগনচারিণী ভৈরবী রাক্ষসী, অন্ধকারবৎ শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইয়া ভীম বাত্যায় ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতেছে—শৈবলিনীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখে জল পড়িতেছে, তাহারা হুঁ করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন, কত দেব-দেবীর বিমানের কৃষ্ণভাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে; পাছে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীশবের ছায়া বিমানের পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবলিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন। দেখিলেন, নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে,—"দেখ, ভগিনি, দেখ, মনুষ্যকীটের মধ্যে আবার অসতী

আছে। কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; কোন তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, তারপর আরও ঊর্দ্ধে, আরও মেঘ, আরও তারা পার হইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। অতি ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কলকল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—যেন অতিদূরে, অধোভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জ্জিতেছে। পিশাচেরা বলিল, "ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও।" এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল। ক্রমে নরকের গর্জ্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পূতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল, মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—"কোথায় স্বামী! কোথায় প্রভু! স্ত্রীজাতির জীবন সহায়, আরাধনার দেবতা, সর্ব্বে মঙ্গলমঙ্গল! কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র, সহস্র প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকট অপরাধ করিয়া, আমি এই নরক-কুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারে না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

তখন অন্ধ বধির মৃতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক্

ঘুচিল। সেই দুরন্ত নরক রব, সহসা অন্তর্হিত হইল, পূতিগন্ধের পরিবর্ত্তে কুসুম গন্ধ ছুটিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাতকূজন শুনা যাইতেছে—কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাহার মাথা রহিয়াছে—কাহার মুখমণ্ডল, তাহার মস্তকোপরি গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতান্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিনী চিনিল, চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারি-বেশে চন্দ্রশেখর!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নৌকা ডুবিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিল, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল, মাথা ঘুরিল; শৈবলিনী পড়িয়া গেল; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে লুণ্ঠিত হইল। চন্দ্রশেখর তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর করিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃপতিত হইয়া বলিল, "এখন আমার দশা কি হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিল, রোদন সংবরণ করিল—স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "বোধ হয়, আমি আর অতি অল্প দিন বাঁচিব।" শৈবলিনী শিহরিল—স্বপ্ন দৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—"অল্প দিন বাঁচিব মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ

আমার কে বিশ্বাস করিবে ? কেন বিশ্বাস করিবে ? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি ?”

শৈবলিনী কাতরাতর বিকট হাসি হাসিল।

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন ; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, “শৈবলিনী, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।”

শৈবলিনী হাতযোড় করিল ;—বলিল, “আর একবার বসো। বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।” আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—“বসো—তোমায় ক্ষণেক দেখি।” চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, “আত্মহত্যায় পাপ আছে কি ?” শৈবলিনী স্থিরদৃষ্টিতে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিল, তাহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল।

চন্দ্র। আছে। কেন মরিতে চাও ?

শৈবলিনী শিহরিল। বলিল, মরিতে পারিব না—সেই নরকে পড়িব।”

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই নরক হইতে উদ্ধার পাইবে।

শৈ। এ মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

চন্দ্র। সে কি ?

শৈ। এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন বলিতে পারি না—আমি রাত্রিদিন নরক স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি আকাশে স্থাপিত হইয়াছে—যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার শীর্ণ

বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষুঃ বিস্ফারিত, পলকরহিত হইল—নাসা রন্ধ্র, স্ফীত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কণ্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি "দেখিতেছ?"

শৈবলিনী কথা কহিল না পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভয় পাইতেছ?" শৈবলিনী প্রস্তরবৎ।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—'প্রভু! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রাখিলে কে রাখে?'

শৈবলিনী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন। উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনা প্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি দেখিতেছিলে?" শৈ। সেই নরক!

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী ক্ষণপরে বলিল, "আমি মরিতে পারিব না-আমার ঘোরতর নরকের ভয় হইয়াছে। মরিলেই নরকে যাইব। আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসর কি প্রকারে বাঁচিব? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নরক দেখিতেছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন' "চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে, এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যেরা ইহাকে বায়ুরোগ বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধারণ করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।"

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিল—দেখিল, গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাঁড়াইয়া, প্রস্তরে উৎকীর্ণা—অঙ্গুলি তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল, সুন্দরী অতি দীর্ঘাকৃতা, ক্রমে তালবৃক্ষপরিমিতা হইল, অতি ভয়ঙ্করী! দেখিল, সেই গুহা প্রান্তে সহসা নরক সৃষ্ট হইল—

সেই পূতিগন্ধ, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্জ্জন, সেই উত্তাপ, সেই শীত, সেই সর্পারণ্য, সেই কদর্য্য কীটরাশিতে গগন অন্ধকার। দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা কণ্টকের রজ্জুহস্তে, বৃশ্চিকের বেত্রহস্তে নামিল—রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া, বৃশ্চিকবেত্রে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল; তালবৃক্ষপরিমিতা প্রস্তরময়ী সুন্দরী হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—"মার! মার! আমি বারণ করিয়াছিলাম! আমি নৌকা হইতে ফিরাইতে গিয়াছিলাম, শুনে নাই। মার্! মার! যত পারিস্ মার্! আমি উহার পাপের সাক্ষী! মার্! মার!" শৈবলিনী যুক্তকরে উন্নত আননে, সজল-নয়নে সুন্দরীকে মিনতি করিতেছে; সুন্দরী শুনিতেছে না; কেবল ডাকিতেছে, "মার্! মার! অসতীকে মার্! আমি সতী ও অসতী! মার্! মার্!" শৈবলিনী আবার সেইরূপ দৃষ্টিস্থির লোচন বিস্ফারিত করিয়া বিশুষ্কমুখে, স্তম্ভিতের ন্যায় রহিল। চন্দ্রশেখর চিন্তিত হইলেন—বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে। বলিলেন "শৈবলিনী! আমার সঙ্গে আইস।"

প্রথমে শৈবলিনী, শুনিতে পাইল না। পরে চন্দ্রশেখর, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া দুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন. "আমার সঙ্গে আইস।"

সহসা শৈবলিনী দাঁড়াইয়া উঠিল, অতি ভীতস্বরে বলিল, "চল, চল, শীঘ্র চল, শীঘ্রচল, এখান হইতে শীঘ্র চল।" বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া, গুহাদ্বারাভিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের প্রতীক্ষা না করিয়া, দ্রুত পদে চলিল; দ্রুত চলিতে, গুহার অস্পষ্ট আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল; পদস্খলিত হইয়া শৈবলিনী ভূপতিতা হইল। আর শব্দ নাই। চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

তখন চন্দ্রশেখর, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অতিক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদগার করিতেছিল—তথায় আসিলেন। মুখে জলসেক করাতে, এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল—বলিল, "আমি কোথায় আসিয়াছি?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।"

শৈবলিনী শিহরিল—আবার ভীতা হইল। বলিল, "তুমি কে?" চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "কেন এরূপ করিতেছ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন?"

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল,

"স্বামী আমার সোণার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে।
তেকাটাতে এলে, সখা, বুঝি পথ ভুলে?

তুমি লরেন্স্ ফষ্টর?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাতেই এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার স্বর্ণ মন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদুস্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, "শৈবলিনী কে? রসো রসো। একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটিকে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি! হাঁ গা সাহেব! তুমি কি লরেন্স্ ফষ্টর?"

চন্দ্রশেখর গদ্গদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব, এ কি করিলে? এ কি করিলে?"

শৈবলিনী গীত গায়িল,

"কি করিলে প্রাণসখী, মনচোর ধরিয়ে,
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে।"

বলিতে লাগিল, "মনচোর কে? চন্দ্রশেখর। ধরিল কাকে? চন্দ্রশেখরকে। ভাসিল কে? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি? জানি না। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমিই চন্দ্রশেখর।"

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল।

চন্দ্রশেখর কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—“আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “চল।”

শৈবলিনী বলিল, “আমাকে মারিবে না?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “না।”

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিল। চন্দ্রশেখর বিষণ্ণবদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কখনও হাসিতে লাগিল—কখনও কাঁদিতে লাগিল—কখনও গায়িতে লাগিল।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রচ্ছাদন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমিয়টের পরিণাম।

মুরশিদাবাদে আসিয়া, ইংরেজের নৌকা-সকল পৌঁছিল। মীরকাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সংবাদ আসিল যে, আমিয়ট্ পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট্ আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়ট্‌কে আহারার্থে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রফুল্লমনে নহে। এ দিকে মহম্মদ তকি দূরে অলক্ষিতরূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না। গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। আমিয়ট্ বলিলেন, “যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি এবং অসদ্ভাব

যত দূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার ইহাদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহার কি ?" আমিয়ট্‌ স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

এ দিকে যে নৌকায় দলনী ও কুল্‌সম্‌ বন্দিরূপে সংরক্ষিতা ছিলেন, সে নৌকাতেও নিমন্ত্রণের সংবাদ পৌঁছিল। দলনী ও কুল্‌সম্‌ কানে কানে কথা কহিতে লাগিল। দলনী বলিল, "কুল্‌সম্‌—শুনিতেছ ? বুঝি মুক্তি নিকট।" কু। কেন।

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস্‌ না ; যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে, নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজি ইংরেজ মরিবে।

কু। তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইয়াছে ?

দ। নহে কেন ? একটা রক্তারক্তি না হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আহ্লাদ বৈ নাই।

কু। কিন্তু মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন ? আমাদের আটক রাখা ভিন্ন ইহাদের আর কোন অভিসন্ধি দেখা যায় না। আমাদের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিতেছে না। কেবল আটক। আমরা স্ত্রীজাতি, যেখানে যাইব সেইখানেই আটক।

দলনী বড় রাগ করিল। বলিল, "আপন ঘরে আটক থাকিলেও আমি দলনী বেগম, ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে, বলিতে পারিস্‌ ?

কু। তা ত বলিয়াই রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনই নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি। হে সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটিবে ; নহিলে ভয় কি ?

দলনী আরও রাগিল, বলিল, "আমি তোর হে সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না। ছাড়িয়া দিলেও তুই বুঝি যাইবি না।"

কুল্‌সম্‌ রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিল, "যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও?"

দলনীর রাগ বাড়িতে লাগিল, বলিল, "তাও কি সাধ না কি?"

কুল্‌সম্‌ গম্ভীরভাবে বলিল, "কপালের লিখন কি বলিতে পারি?"

দলনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বড় জোরে একটা ছোট কিল উঠাইল। কিন্তু কিলটী আপাততঃ পুঁজি করিয়া রাখিল—ছাড়িল না। দলনী আপন কর্ণের নিকট সেই কিলটি উত্থিত করিয়া—কৃষ্ণকেশ-গুচ্ছ-সংস্পর্শে যে কর্ণ, সভ্রমর প্রস্ফুট কুসুমবৎ শোভা পাইতেছিল, তাহার নিকট কোমল কোরক তুল্য বদ্ধ মুষ্টি স্থির করিয়া বলিল, "তোকে আমিয়ট্‌ দুই দিন কেন ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বল্‌ ত?"

কু। সত্য কথা ত বলিয়াছি, তোমার কোন কষ্ট হইতেছে কি না—তাহাই জানিবার জন্য। সাহেবদিগের ইচ্ছা, যত দিন আমরা ইংরেজের নৌকায় থাকি, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকি। জগদীশ্বর করুন, ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে।

দলনী কিল আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিল, "জগদীশ্বর করুন, তুমি শীঘ্র মর।"

কু। ইংরেজ ছাড়িলে, আমরা ফের নবাবের হাতে পড়িব। নবাব তোমাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চিন্ত বুঝিতে পারি। আমার এমন মন হয়, যে, যদি কোথায় আশ্রয় পাই, তবে আর নবাবের হুজুরে হাজির হইব না।

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, "আমি অনন্যগতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।"

এ দিকে আমিয়ট্‌ আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহীগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জনসন্‌ বলিলেন, "এখানে আমরা তত বলবান্‌ নহি—রেসিডেন্সির নিকট নৌকা লইয়া গেলে হয় না?"

আমিয়ট্‌ বলিলেন, "যে দিন, একজন ইংরেজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে, সেই দিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা

নিরুদ্বিগ্ন হইবে। এখান হইতে নৌকা খুলিলেই মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফষ্টর পীড়িত। শস্ত্রহস্তে মরিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও এবং দুই জন সিপাহি সঙ্গে দাও। বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।"

সিপাহিগণ সজ্জিত হইলে, আমিয়টের আজ্ঞানুসারে নৌকার মধ্যে সকলে প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিল। ঝাঁপের বেড়ায় নৌকায় সহজেই ছিদ্র পাওয়া যায়, প্রত্যেক সিপাহী এক এক ছিদ্রের নিকটে বন্দুক লইয়া বসিল। আমিয়টের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুল্‌সম্ ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। দুই জন সিপাহী সঙ্গে ফষ্টর নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সংবাদ দিতে গেল।

এ সংবাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া মহম্মদ তকি, ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট্ উত্তর করিলেন যে, কারণ বশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া, একটা ফাকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে, তীর হইতে দশ বারটা বন্দুকের শব্দ হইল। আমিয়ট্ দেখিলেন, নৌকার উপর গুলি বর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে স্থানে নৌকার ভিতরে গুলি প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ সিপাহীরাও উত্তর দিল। উভয় পক্ষে, উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে শব্দে হুলস্থূল পড়িল। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মুসলমানেরা তীরস্থ গৃহাদির অন্তরালে লুকায়িত; ইংরেজ এবং তাঁহাদিগের সিপাহীগণ নৌকামধ্যে লুকায়িত। এরূপ যুদ্ধে বারুদ খরচ ভিন্ন অন্য ফলের আশু কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন, মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ ইংরেজেরা ভীত হইল না।

বিপত্তিতে নৌকাখণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনপ্রবৃত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট্, গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতিবারে এক এক জন এক এক জন যবনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবন-শ্রেণী নামিতে লাগিল। তখন আমিয়ট্ বলিলেন, "আর আমাদিগের রক্ষার কোন উপায় নাই। আইস আমরা বিধর্ম্মী নিপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি।"

ততক্ষণে মুসলমানেরা গিয়া আমিয়টের নৌকায় উঠিল। তিন জন ইংরেজ এক হইয়া এককালীন আওয়াজ করিলেন। ত্রিশূলবিদ্ধের ন্যায় নৌকারূঢ় যবনশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নৌকা হইতে জলে পড়িল।

আরও মুসলমান নৌকার উপর উঠিল। আরও কতকগুলা মুসলমান মুদ্গরাদি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় কল কল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট্ সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব কেন? বাহিরে আইস, বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি।"

তখন তরবারিহস্তে তিন জন ইংরেজ অকুতোভয়ে, সেই অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন যবন আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, "কেন মরিবেন? আমাদিগের সঙ্গে আসুন।"

আমিয়ট্ বলিলেন, "মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জ্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

"তবে মর।" এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিল। দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গল্‌ষ্টন্ সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ বার জন যবনে গল্‌ষ্টন্‌কে বেড়িয়া প্রহার করিতে লাগিল। এবং অচিরাৎ বহুলোকের প্রহারে আহত হইয়া গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপর শুইলেন।

তৎপূর্ব্বেই ফষ্টর নৌকা খুলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার সেই।*

যখন রামচরণের গুলি খাইয়া লরেন্স্ ফষ্টর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রতাপ বজ্‌রা খুলিয়া গেলে পর, হাতিয়ারের নৌকার মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, ফষ্টরের দেহের সন্ধান করিয়া উঠাইয়াছিল; সেই নৌকার পাশ দিয়াই ফষ্টরের দেহ ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহারা ফষ্টরকে উঠাইয়া নৌকায় রাখিয়া আমিয়টকে সংবাদ দিয়াছিল।

আমিয়ট্ সেই নৌকার উপর আসিলেন। দেখিলেন, ফষ্টর অচেতন, কিন্তু প্রাণ নির্গত হয় নাই। মস্তিষ্ক ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া চেতনা বিনষ্ট হইয়াছিল। ফষ্টরের মরিবারই অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। আমিয়ট্ চিকিৎসা করিতে জানিতেন, রীতিমত তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বকাউল্লার প্রদত্ত সন্ধান মতে, ফষ্টরের নৌকা খুঁজিয়া ঘাটে আনিলেন। যখন আমিয়ট্ মুঙ্গের হইতে যাত্রা করেন, তখন মৃতবৎ ফষ্টরকে সেই নৌকায় তুলিয়া আনিলেন।

ফষ্টরের পরমায়ু ছিল—সে চিকিৎসায় বাঁচিল। আবার পরমায়ু ছিল, মুরশিদাবাদে মুসলমানহস্তে বাঁচিল। কিন্তু এখন সে রুগ্ন বলহীন—তেজোহীন—আর সে সাহস—সে দম্ভ নাই। এক্ষণে সে প্রাণভয়ে ভীত, প্রাণভয়ে পলাইতেছিল। মস্তিষ্কের আঘাত জন্য বুদ্ধিও বিকৃত হইয়াছিল।

ফষ্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয়, পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। প্রথমে সে কাশিমবাজারের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইবে মনে করিয়াছিল—তাহাতে ভয় হইল, পাছে মুসল-

না। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে। তুমি দিতে পার ?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না। বলিলেন, "শান্ত্রি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।" খান্‌সামা সান্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। সান্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খান্‌সামা হুকুম করাইতে গেল। পরের জন্য এত জল বেড়াবেড়ি কে করে ? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খান্‌সামা, কখনও ইচ্ছা-পূর্ব্বক পরের উপকার করে না। পৃথিবীতে যত প্রকার মনুষ্য আছে, ইংরাজদিগের মুসলমান খান্‌সামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু স্বার্থ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটার খাওয়া দাওয়া হইলে ইহাকে একবার খান্‌সামা মহলে লইয়া গিয়া বসাইব। পীরবক্স শৈবলিনীকে আহার করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রতাপের নৌকার শৈবলিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—খান্‌সামা হুকুম করাইতে আমিয়ট্ সাহেবের নিকট গেল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র। আমিয়ট্ দেখিয়াছিলেন যে, এই "জেণ্টু" স্ত্রীলোকটি নিরুপমা রূপবতী—তাহাতে আবার পাগল শুনিয়া একটু দয়াও হইয়াছিল। আমিয়ট্ জমাদার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। সান্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায়—পলায়ন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। সান্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল—নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না।

শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে, দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ঈষৎ হর্ষ প্রফুল্ল—মুখমণ্ডল স্থিরপ্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে!

শৈবলিনী অতি লঘুস্বরে, কানে কানে বলিল, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল?"

প্রতাপ হাত ধুইল। সেই সময়ে শৈবলিনী কানে কানে বলিল, "এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিল, "আগে তুমি যাও। নচেৎ তুমি বিপদে পড়িবে।"

শৈ। এই বেলা পলাও। হাতকড়ি দিলে আর পলাইতে পারিবে না। এই বেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল। আমি পাগল, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ভাত খাইব না।" তখনই আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

"কি হইল? কি হইল? বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে করিতে নৌকা হইতে বাহির হইল। সান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ?" এই বলিয়া প্রতাপ সিপাহীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী পান্সী হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর" বলিয়া প্রতাপ অপর দিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণ-পটু শৈবলিনী আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

"কয়েদি ভাগিল" বলিয়া পশ্চাতের সান্ত্রী ডাকিল। এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—পলাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে স্ত্রীহত্যা কি প্রকারে দেখিব? তুই বাপু হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস্।" সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্ব্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিল। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। দেখিল যে, যে নৌকায় শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিল, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিতা হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তাহার ছাদে, জ্যোৎস্নার আলোকে, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর একটী সাহেব অর্দ্ধশয়নাবস্থায় রহিয়াছে। উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার শব্দ করিল—দেখিল, পালঙ্কে লরেন্স ফষ্টর।

লরেন্স ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে চিনিল—শৈবলিনী। লরেন্স ফষ্টরও চীৎকার করিয়া বলিল, "পাকড়ো! পাকড়ো? হামারা বিবি!" ফষ্টর শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি পাঁচজন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহারা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! ফষ্টর সাহেব ইনাম্ দেগা।" প্রতাপ মনে মনে বলিল, "ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম্ দিয়াছি—ইচ্ছা আছে, আর একবার দিব।" প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিল, "আমি ধরিতেছি—তোমরা উঠ।"

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফষ্টরের মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অগাধ জলে সাঁতার।

দুই জনে সাঁতারিয়া, অনেকদূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত-দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকরসাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কালসমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে, আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি!

তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া ত জড়প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না,—তারা তেমনি জ্বলে—তীরে বৃক্ষ তেমনই দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনই খেলে। জড়-প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে! শৈবলিনী নৌকার উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ শ্বেতমুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলীর ন্যায় সাঁতার দিতেছিল। কিন্তু শান্তি নাই। উভয়ে সন্তরণপটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ"।

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল, হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কত কাল পরে! বৎসরে কি কালের

সূর্য্যের ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন, তোমার স্বাংলী কর্ণাভরণ দোলাইয়া, তিরস্কার করিতে করিতে তোমায় পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন চন্দ্রকিরণপ্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ুপ্রপীড়নে সফেন তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদের আলোতে জ্বলিতে থাকে তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন, স্পার্কলিংস্যাম্পেন তরঙ্গ তুলিয়া স্ফটিকপাত্রে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বল মধুরে মিশে। যখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দক্ষিণ বায়ু মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন, সন্দেশময় ফলাহারের পাতে, রজতমুদ্রা দক্ষিণা মিশে তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন প্রাতঃসূর্য্যকিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, রমণী-সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই মিশিল না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে মিশিল, গুর্‌গন্ খাঁ।

বাঙ্গালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই পাটনার এলিস্ সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান সৈন্য প্রেরিত হইয়া পাটনাস্থিত মুসলমান সৈন্যের সহিত একত্র হইয়া, পাটনা পুনর্ব্বার মীরকাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এলিস্ প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরেজেরা মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া, মুঙ্গেরে বন্দিভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয়পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুর্‌গন খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্যগীত উপলক্ষ মাত্র—জগৎশেঠেরা বা গুর্‌গন্ খাঁ কেহই তাহা শুনিতে ছিলেন না। সকলে যাহা করে, তাঁহারাও তাহাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে, কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায়?

গুর্‌গন্ খাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে, উভয় পক্ষ বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইলে, তিনি উভয় পক্ষকে পরা-

জিত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলাষ সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠ কুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ গুরগন খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

এদিকে, কাসেম আলিখাঁও বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে পক্ষকে এই কুবেরযুগল অনুগ্রহ করিবেন, সেই পক্ষ জয়ী হইবে। জগৎ-শেঠেরা মনে মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও তিনি বুঝিয়া-ছিলেন; কেন না তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। সন্দেহবশতঃ তাহাদিগকে মুঙ্গেরে বন্দিস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তাহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তাহারা ভয়প্রযুক্ত মীরকাসেমের প্রতিকূলে কোন আচরণ করে নাই; কিন্তু এক্ষণে অন্যথা রক্ষার উপায় না দেখিয়া, গুর্গন্ খাঁর সঙ্গে মিলিল। মীরকাসেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিনা কারণে জগৎশেঠদিগের সঙ্গে গুর্গন্ খাঁ দেখা-সাক্ষাৎ করিলে, নবাব সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন বিবেচনায়, জগৎ-শেঠেরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া, গুর্গন্ খাঁ এবং অন্যান্য রাজা-মাত্যবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

গুর্গন্ খাঁ নবাবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অমাত্যগণ হইতে পৃথক বসিয়াছিলেন। জগৎশেঠেরা যেমন সক-লের নিকট আসিয়া এক একবার আলাপ করিতেছিলেন—গুর্গন্ খাঁর সঙ্গে সেইরূপ মাত্র—অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতেছিলেন না। কিন্তু কথাবার্ত্তা অন্যের অশ্রাব্য স্বরে হইতেছিল। কথোপকথন এই রূপ—

গুর্গন্ খাঁ বলিতেছেন—"আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠি খুলিব—আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন?"

মাহতাব চন্দ।—কি মতলব?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য।

মাহ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুর্গন্ খাঁ বলিলেন, "যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার আঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে—আমি শারীরিক পরিশ্রম করিব।"

সেই সময়ে মনিয়া বাই নিকটে আসিয়া সমদী খেয়াল গায়িল "শিখে হো ছল ভালা" ইত্যাদি। শুনিয়া মাহতাব হাসিয়া বলিলেন, "কাকে বলে? যাক্—আমরা রাজি আছি—আমাদের মূলধন সুদে আসলে বজায় থাকিলেই হইল—কোন দায়ে না ঠেকি।"

এইরূপে একদিকে, বাইজি কেদার হাম্বির, ছায়ানট ইত্যাদি রাগ ঝাড়িতে লাগিল, আর একদিকে, গুর্গন্ খাঁ ও জগৎশেঠ রূপেয়া, নোকসান, দর্শনী প্রভৃতি ছেঁদো কথায় আপনাদিগের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইলে গুর্গন খাঁ বলিতে লাগিলেন, "একজন নূতন বণিক কুঠি খুলিতেছে, কিছু শুনিয়াছেন?" মাহ। না—দেশী না বিলাতি?

গুর্। দেশী। মাহ। কোথায়?

গুর্। মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানে। যেখানে পাহাড়, যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে তাহার কুঠি বসিতেছে। মাহ। ধনী কেমন?

গুর্। এখনও বড় ভারি ধনী নয়--কিন্তু কি হয় বলা যায় না।

মাহ। কার সঙ্গে তাহার লেনদেন?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠীর সঙ্গে।

মাহ। হিন্দু না মুসলমান? গুর্। হিন্দু।

মাহ। নাম কি? গুর্। প্রতাপ রায়।

মাহ। বাড়ী কোথায়? গুর্। মুরশীদাবাদের নিকট।

মাহ। নাম শুনিয়াছি—সে সামান্য লোক।

গুর্। অতি ভয়ানক লোক।

মাহ। কেন সে হটাৎ এ প্রকার করিতেছে?

গুর্। কলিকাতার বড় কুঠির উপর রাগ।

মাহ। তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে—সে কিসের বশ?

গুর্। কেন সে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা না জানিলে বলা যায় না। যদি অর্থলোভে বেতনভোগী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিনিতে কতক্ষণ? জমীজমা তালুক মুলুকও দিতে পারি। কিন্তু যদি ভিতরে আর কিছু থাকে?

মহ। আর কি-থাকিতে পারে? কেন প্রতাপ রায় এত মাতিল?

বাইজি সে সময়ে গায়িতেছিল, "গোরে গোরে মুখ পর বেশর শোহে।"

মাহতাব্‌চন্দ বলিলেন, "তাই কি? কার গোরা মুখ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দলনী কি করিল।

মহাকায় পুরুষ, নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিল।

দলনী কাঁদিতেছিল, ভয় পাইয়া রোদন সংবরণ করিল, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। আগন্তুকও নিঃশব্দে রহিল।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল।

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগত হইবেন। সুতরাং অনুচর-বর্গকে বেগম-সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পরে যখন, মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি দেখিলেন যে, বিষম বিপদ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদতকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে-বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোক পরম্পরায় তখন শুনা যাইতেছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারা

রামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ রহিল না।

যে রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিল, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গমনকালে, রামচরণ অস্ফুটস্বরে ইণ্ডিল মিণ্ডিলের পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল। পা জোড়া লাগিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বতোপরি।

আজি রাত্রিতে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ;—তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার, তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষরাত্রে, ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া, তীরে লাগিয়াছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটী নিভৃত স্থানে ছিপ লাগিয়াছিল। সেই সময়ে শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ-সৌন্দর্য্য-প্রণয়াদি-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে কেমন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া

থাকিতে পারে। বিক্টর হ্যুগো যে সমুদ্রতলবাসী রাক্ষসজাতীয় ভয়ঙ্কর পুরুভুজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অতি স্বচ্ছ স্ফটিক-নিন্দিত জলমধ্যে বাস করে, ইহার বাসগৃহতলে মৃদুল জ্যোতিঃ-প্রফুল্ল চারু গৈরিকাদি ঈষৎ জলিতে থাকে; ইহার গৃহে কত মহা-মূল্য মুক্তা-প্রবালাদি কিরণ প্রচার করে; কিন্তু ইহা মনুষ্যের শোণিত পান করে; যে ইহার গৃহসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথায় গমন করে, এই শতবাহু রাক্ষস, ক্রমে এক একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরে; ধরিলে আর কেহ ছাড়াইতে পারে না। শত হস্তে সহস্র গ্রন্থিতে জড়াইয়া ধরে; তখন রাক্ষস, শোণিত-শোষক সহস্র মুখ হতভাগ্য মনুষ্যের অঙ্গে স্থাপন করিয়া, তাহার শোণিত-শোষণ করিতে থাকে।

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই, তাহার সন্ধান করিবে। এজন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিল, ততদূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল। গিরি আরোহণ করিলে, পাছে, অনুসন্ধান-প্রবৃত্ত কেহ তাহাকে পায়, এজন্য দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইল না। বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। সমস্ত দিন অনাহারে গেল। সায়াহ্নকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিবে শৈবলিনী অন্ধকারে, গিরি-আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতা গুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কণ্টকে, ভগ্ন শাখাগ্রভাগে বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া, এ ভীষণ কণ্টকময়, হিংস্রজন্তুপরিপূরিত পর্ব্বতারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এতকাল যে গুরুতর পাপে নিমগ্ন

হইয়াছিল—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন শমতা হইবে?

অতএব ক্ষতবিক্ষতচরণে, শোণিতাক্ত-কলেবরে, ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসা-পীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি-আরোহণ করিতে লাগিল। পথ নাই—লতা-গুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিয়েও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার। অতএব শৈবলিনী বহু কষ্টে অল্পদূর মাত্র আরোহণ করিল।

এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্ত বিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া, গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল জগতে প্রস্তর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পর্ব্বতারোহণ-চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিল।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত, বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর! সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ বাত্যা সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। একবিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা। তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। সে গর্জ্জন, বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ-শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনতমস্তকে পর্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষলতা-গুল্মাদির শাখা সকল বায়ুতাড়িত হইয়া প্রহত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে। শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম-বেগে আসিয়া শৈবলিনীর ঊরুদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে

তুমি জড়-প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাহাতে কত সুখে যুবক-যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিনী! কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল; ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিল যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। তখন তাহার গার্হস্থ-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্য্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃ পুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছি, অদ্য সে নিকট। এমন সময়ে সেই মনুষ্যশূন্য পর্ব্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে, সেই মহাঘোর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিল, কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিল। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্যহস্তের

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তোমার বাহুতে বল কত ?"

চন্দ্রশেখর হাসিয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর হস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "উত্তম। শৈবলিনীর নিকটে গিয়া অন্তরালে বসিয়া থাক, শৈবলিনী আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পাইলে স্ত্রীহত্যা হইবে। নিকটে এক গুহা আছে। আমি তাহার পথ চিনি। আমি যখন বলিব, তখন তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও।"

চ। এখনই ঘোরতর অন্ধকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে ?

র। আমি নিকটেই থাকিব। আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দিব। অপর ভাগ আমার হস্তে থাকিবে।

শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন "আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা। এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না। এ সমুদ্রের কি তল নাই ?" এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "নিকটে এক পার্ব্বত্য মঠ আছে, সেইখানে অদ্য গিয়া বিশ্রাম কর। শৈবলিনীর পক্ষে যৎকর্ত্তব্য সাধিত হইলে, তুমি পুনরপি যবনীর অনুসরণ করিবে। মনে জানিও, পরহিত ভিন্ন তোমার ব্রত নাই। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি এখানে রহিলাম। কিন্তু তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি যদি আমার মতে কার্য্য কর, তবে শৈবলিনীর পরমোপকার হইতে পারে।"

এই কথার পর চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রমানন্দ স্বামী তাহার পর, অন্ধকারে, অলক্ষ্যে, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন

তাহার পর যাহা ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন।

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দ স্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে ?"

রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইঁহাকে রাখিও। যাঁহারা ইঁহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ইঁহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও। প্রতাপকেও যেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

গুরুর আদেশ মত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হুকুম।

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুরগন্ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্ব্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সংবাদ পৌঁছিল। জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীরকাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব? আমাকে বেইজ্জৎ করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

দলনী হাসিয়া বলিলেন "আপনাকে কে বলিল ?"

মহম্মদ তকি বলিলেন, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই।

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের দস্তমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন। দলনী পরওয়ানা পড়িয়া হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরিবে সেই জন্য ?"

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি।

দ। ওহো! তোমার কিছু মৎলব আছে! তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ ?

মহ। তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি আমিয়টের নৌকায় তাহার উপপত্নীস্বরূপ ছিলেন, সেই জন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। স্থিরবারিশালিনী ললাটগঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল—ভ্রূধনুতে চিন্তাগুণ দিল—মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল। দলনী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছিলে ? মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিলেন, "দেখি, পরওয়ানা আবার দেখি।"

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনী হস্তে দিল। দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন, যথার্থ বটে। জাল নহে। "কই বিষ ?"

"কই বিষ ? শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন ?"

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে।

মহ। আপনারে বিষপান করাইতে।

দ। তবে কই বিষ ?

মহ। আপনি বিষপান করিবেন না কি ?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না ?

মহম্মদ তকি মর্ম্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন, যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরী—নবীনা—সবে মাত্র যৌবনবর্ষায় রূপের নদী পূরিয়া উঠিতেছে, ভরা বসন্তে অঙ্গ-মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বর্ষায় একত্র মিশিয়াছে। যাকে দেখিতেছি—সে দুঃখে ফাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিয়া কত সুখ! জগদীশ্বর! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? এই যে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত, প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব? সয়তান আসিয়া তকির কানে কানে বলিল—"হৃদয় মধ্যে।"

তকি বলিল, "শুন সুন্দরী—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।"

শুনিয়া দলনী— লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন।

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি অর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে, চাহিতে ধীরে, ধীরে ধীরে, ফিরিয়া গেল।

তখন দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—'ও রাজরাজেশ্বর! শাহানশাহা! বাদশাহের বাদশাহ! এ গরিব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রনা! হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার ভরসা—পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার সাগর কোথায় রহিলে? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না, এই আমার দুঃখ!

করিমন্ নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে ডাকিয়া, দলনী, আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "লুকাইয়া হাকিমের নিকট হইতে আমাকে এমন ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে। মূল্য, এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যাহা থাকে তুমি লইও।"

করিমন, দলনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। প্রথমে সে সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। শেষে মূর্খ লুব্ধ স্ত্রীলোক, অধিক অর্থের লোভে, স্বীকৃত হইল।

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সংবাদ দিল,—"করিমন্ বাঁদি আজ এই মাত্র হাকিম মেরজা হবীবের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।"

মহম্মদ তকি করিমন্‌কে ধরিলেন। করিমন্ স্বীকার করিল। বলিল, "বিষ দলনী বেগমকে দিয়াছি।"

মহম্মদ তকি শুনিয়াই দলনীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন, দলনী আসনে উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধদৃষ্টিতে, যুক্তকরে বসিয়া আছে—বিস্ফারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা গণ্ড বহিয়া বক্ষে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছে।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে?"

দলনী বলিলেন, "ও বিষ। আমি তোমার মত নিমকহারাম নহি—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—অবশিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে ধীরে শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্রাট ও বরাট।

মীর কাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হটিয়া

আসিয়াছিল। তাহার কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল—আবার যবনসেনা ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃস্পার্শে বাঁধ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ-সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিলেন।

মীরকাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমীর হোসেন, একদা জানাইল যে, একজন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর। তাহার কোন বিশেষ নিবেদন আছে—হুজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না।

মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "একজন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারন্ হেষ্টিং সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অপরাধ হইয়া থাকে, গোলাম হাজির আছে।" এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে শুনাইলেন।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ লিখিয়াছেন, "এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভাল মন্দ কিছু জানি না।"

নবাব পত্র শুনিয়া, স্ত্রীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন—নবাব দেখিলেন—কুল্‌সম্।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি, চাহিস বাঁদী—মরিবি—?"

কুল্‌সম্ নবাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল, "নবাব! তোমার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!" আমীর হোসেন

কুল্‌সমের বাক্যপ্রণালী দেখিয়া ভীত হইল এবং নবাবকে অভি-বাদন করিয়া সরিয়া গেল।

মীর কাসেম বলিলেন, "যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেই খানে শীঘ্র যাইবে।"

কুল্‌সম্ বলিল, "আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। পথে শুনিলাম, লোকে রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি?"

নবাব। আত্মহত্যা। রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্ম্মের সহায়—তুই কুকুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি—

কুল্‌সম্ আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া নাবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারিদিক্ হইতে সৈনিক, ওমারাহ, ভৃত্য, রক্ষকপ্রভৃতি আসিয়া পড়িল—একজন কুল্‌সমের চুল ধরিয়া তুলিতে গেল। নবাব নিষেধ করিলেন—তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সরিয়া গেল। তখন কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এক্ষণই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না। এই সময় শুনুন।"

"শুনুন, সুবে বাঙ্গালা বেহারের, মীর কাসেম নামে, এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুরগন্ খাঁর ভগিনী।"

শুনিয়া কেহ আর কুল্‌সমের উপর আক্রমণ করিল না—সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছুই বলিলেন না—কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "গুরগন্ খাঁ ও দৌলৎউন্নেচ্ছা ইস্পাহান হইতে পর্য্যটন করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন মীর কাসেমের গৃহে বাঁদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।"

কুল্‌সম্ তাহার পরে, যে রাত্রে তাঁহারা দুই জনে গুরগন্ খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুরগন্ খাঁর সঙ্গে

যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে, প্রত্যাবর্ত্তন আর নিষেধ, ব্রহ্মচারীর সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি ইংরেজগণকৃত আক্রমণ এবং শৈবলিনী-ভ্রমে দলনীর হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট্ প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাঁহাদিগের পলায়ন, শেষ দলনীকে গঙ্গাতীরে ফষ্টরকৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল, "আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম—সে কথা যাউক। মনে করিয়াছিলাম, নিজামতের নৌকা পশ্চাৎ আসিতেছে—বেগমকে তুলিয়া লইবে—নহিলে আমি তাঁহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে, আমাকেও নামাইয়া দাও—সে নামাইয়া দেয় নাই। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে, আমাকে পাঠাইয়া দাও—কেহ কিছু বলে নাই। শুনিলাম, হেষ্টিংস সাহেব বড় দয়ালু—তাঁহার কাছে কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলাম—তাঁহারই কৃপায় আসিয়াছি। এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।"

এই বলিয়া কুল্‌সম্ কাঁদিতে লাগিল।

বহুমূল্য সিংহাসনে, শত শত রশ্মি-প্রতিঘাতী রত্নরাজির উপরে বসিয়া, বাঙ্গলার নবাব,—অধোবদন। এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড, তাঁহার হস্ত হইতে ত স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—বহুযত্নেও ত রহিল না। কিন্তু যে অজেয় রাজ্য বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল! তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুল্‌সম্ সত্যই বলিয়াছে—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ!

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ! তোমরা পার সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া

থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব”—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহমধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায়, কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সংবরণ করিয়া মীরকাসেম বলিতে লাগিলেন, “শুন বন্ধুবর্গ। যদি আমাকে সেরাজউদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজ বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব—আলি-হিব্রাহিম খাঁ?”

হিব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন। নবাব বলিলেন, তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।”

হিব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, তাম্বুর বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, “আর কেহ আমার উপকার করিবে?”

সকলেই যোড় হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, “কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার?”

আমীর হোসেন বলিলেন, “সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায় চলিলাম।”

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, “আর সেই শৈবলিনীকে? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে?”

মহম্মদ ইরফান যুক্তকরে নিবেদন করিল, “অবশ্য এতদিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।”

এই বলিয়া মহম্মদ ইরফান্ বিদায় হইল।

তাহার পরে নবাব বলিলেন, “যে ব্রহ্মচারী মুঙ্গেরে বেগমকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাঁহার কেহ সন্ধান করিতে পার?”

মহম্মদ ইরফান্ বলিল, “হুকুম হইলে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গের যাইতে পারি।”

শেষ কাসেম্ আলি বলিলেন “গুর্গন্ খাঁ কতদূর?”

অমাত্যবর্গ বলিলেন, “তিনি ফৌজ লইয়া উদয়নালায় আসিতে-

ছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌঁছেন নাই।” নবাব মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, “ফৌজ! ফৌজ! কাহার ফৌজ!”

একজন কে চুপি চুপি বলিলেন, “তাঁরি!”

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া ‘দলনী! দলনী!’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন!

এ সংসারে নবাবি এইরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জন ষ্ট্যাল্‌কার্ট।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্‌ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া ফষ্টরের কার্য্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ইতিহাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কর্ম্মঠ লোক কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্য রক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্যরক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই একজনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা, মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন হেষ্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্যসংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তখন তিনি গবর্ণর হন নাই। কুল্‌সম্‌কে বিদায় করিয়া তিনি ফষ্টরের অনু-

সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফষ্টর পীড়িত। প্রথমে তাহার চিকিৎসা করাইলেন। ফষ্টর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিল।

তাহার পরে তাহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া, ফষ্টর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল যে, ফষ্টরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন; কিন্তু সাক্ষীদিগের কোন সন্ধান নাই, এবং ফষ্টরও নিজকার্য্যের অনেক ফলভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাতে বিরত হইলেন।

ফষ্টর তাহা বুঝিল না। ফষ্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে মনে করিল, তাহার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। সে ক্ষুদ্রাশয়, অপরাধী ভৃত্যদিগের স্বভাবানুসারে পূর্ব্ব প্রভুদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল। তাহাদিগের বৈরতাসাধনে কৃতসংকল্প হইল।

ভাইস সমর নামে একজন সুইস বা জর্ম্মান মীর কাসেমের সেনাদলমধ্যে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়-নালার যবন-শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফষ্টর উদয়-নালায় তাহার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফষ্টরকে গ্রহণ করিল। ফষ্টর আপন নাম গোপন করিয়া, জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া আপন পরিচয় দিয়া সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধান নিযুক্ত, তখন লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন, কুলসমকে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফষ্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, একজন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন

আসন গ্রহণ করিলে সমরু জন্ ষ্ট্যাল্‌কার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যাল্‌কার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন্।

আমীর হোসেন অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যাল্‌কার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন্, "লরেন্স ফষ্টর নামক একজন ইংরাজকে আপনি চিনেন?"

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকাপানে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "লরেন্স ফষ্টর? কই—না।"

আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখনও তাঁহার নাম শুনিয়াছেন?"

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল—"নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ—কই? না।"

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ষ্ট্যাল্‌কার্ট আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না। দুই একবার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর হোসেনের মনে মনে হইতেছিল যে, এ ফষ্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না।

ফষ্টর কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার টুপি লইয়া মাথায় দিয়া বসিল। আমীর হোসেন জানিতেন যে, এটী ইংরেজদিগের নিয়মবহির্ভূত কাজ। আরও, যখন ফষ্টর টুপি মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরস্থ কেশশূন্য আঘাত-চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল। ষ্ট্যাল্‌কার্ট কি আঘাত চিহ্ন ঢাকিবার জন্য টুপি মাথায় দিল!

আমীর হোসেন বিদায় হইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।" কুল্‌সম্ তাঁহার সঙ্গে গেল।

কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্ব্বার সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। কুল্‌সম্ বাহিরে রহিল। ফষ্টর তখনও সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার একজন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য্য আছে।"

সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্সম্ আসিল—ফষ্টরকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন কুল্সম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্সম্ বলিল, "লরেন্স্ ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারীর জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।" সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আবার বেদগ্রামে।

রমানন্দ স্বামী ... চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ, তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশ বাঁকারি পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—উরগজাতি নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঘরের কবাট সকল চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে দ্রব্য সামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে—কোথাও পচিয়াছে, কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। ইন্দুর, আরসুলা, বাদুড় পালে পালে বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখর,

শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিরীক্ষণ করিলেন যে, ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া, পুস্তকরাশি ভস্ম করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী কথা কহিল না; কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্ব্বস্বপ্নদৃষ্ট কন্দরীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না—বিস্ফারিত লোচনে চারিদিক্ দেখিতেছিল—একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলির দ্বারা কি দেখাইল।

এদিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ। শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা, ওকে এনেছ বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল।"

কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী সরিলও না, ঘোমটাও টানিল না বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। সুন্দরী ভাবিল, "বুঝি ইংরেজী ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে।" এই ভাবিয়া, শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, "কি লা! চিন্তে পারিস্?

শৈবলিনী বলিল, পারি—তুই পার্ব্বতী।

সুন্দরী বলিল—"মরণ আর কি, তিন দিনে ভুলে গেলি?

শৈবলিনী বলিল,—"ভুল্‌ব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুঁড়া নাড়া করলুম। পার্ব্বতী দিদি, একটি গীত গা না?

আমার মরম কথা তাই লো তাই
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?
মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ।

কিছু ঠিক পাই নে পার্ব্বতী দিদি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আস্‌বে, সে যেন আসে না—কোথা যেন এসেছি, সেখানে যেন আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।

সুন্দরী বিস্মিতা হইল—চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্‌চকে হইল, তার পরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর একদিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকা সহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায়, শৈবলিনীর জন্য, কেহ কাতর নহে।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না। শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই—তাহা হইলে পার্ব্বতী নাম মনে পড়িবে কেন? কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীত সংলগ্ন হইয়া মনে আসে। সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।

সুন্দরী প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলেন; পরে সেই ভগ্নগৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা একে একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল; আবশ্যক সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহাকে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন।

সেই দিন রমানন্দ স্বামীও সেই স্থানে পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিলেন। আলোক সহকারে সুন্দরী শুনিলেন যে, রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে, চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ঔষধ প্রয়োগের শুভ লগ্ন অবধারিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যোগবল না PSYCHIC FORCE?

ঔষধ কি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশন-ব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয়দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন—পরমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

অবধারিত কালে চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর জন্য, শয্যারচনা করিতে বলিলেন; সুন্দরীর নিযুক্তা পরিচারিকা শয্যারচনা করিয়া দিল।

চন্দ্রশেখর তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শুয়াইতে অনুমতি করিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। সুন্দরী গৃহে গিয়া স্নান করিবে—প্রত্যহ করে।

চন্দ্রশেখর তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবামাত্র আসিও।"

সকলে বাহিরে গেল, চন্দ্রশেখর করস্থ ঔষধপাত্র মাটীতে রাখিলেন শৈবলিনীকে বলিলেন, "উঠিয়া বস দেখি।"

শৈবলিনী, মৃদু মৃদু গীত গায়িতে লাগিল—উঠিল না। চন্দ্রশেখর স্থিরদৃষ্টিতে তাহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে গণ্ডূষ গণ্ডূষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "ঔষধ আর কিছু নহে,

কমণ্ডলুস্থিত জলমাত্র।" চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ইহাতে কি হইবে?" স্বামী বলিয়াছিলেন, "কন্যা ইহাতে যোগবল পাইবে।"

তখন চন্দ্রশেখর তাহার ললাট, চক্ষু, প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল। অচিরাৎ শৈবলিনী ঢলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল।

তখন চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী নিদ্রাবস্থায় বলিল, "আজ্ঞে!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি কে?"

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ নিদ্রিতা—কহিল, "আমার স্বামী।"

চ। তুমি কে? শৈ। শৈবলিনী।

চ। এ কোন্ স্থান? শৈ। বেদগ্রাম—আপনার গৃহ।

চ। বাহিরে কে কে আছে?

শৈ। প্রতাপ ও সুন্দরী এবং অন্যান্য ব্যক্তি।

চ। তুমি এখান হইতে গিয়াছিলে কেন?

শৈ। ফষ্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

চ। এ সকল কথা এতদিন তোমার মনে পড়ে নাই কেন?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

চ। কেন? শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

চ। সত্য সত্য না কাপট্য আছে?

শৈ। সত্য সত্য, কাপট্য নাই। চ। তবে এখন?

শৈ। এখন এ যে স্বপ্ন—আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

চ। তবে সত্য কথা বলিবে? শৈ। বলিব।

চ। তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন? শৈ। প্রতাপের জন্য।

চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন—সহস্রচক্ষে বিগত ঘটনা সকল পুনর্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতাপ কি তোমার জার?"

শৈ। ছি! ছি! চ। তবে কি?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন কেন?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুকায়িত রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে দিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সে দিনে, গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে?"

শৈ। পড়ে। চ। কি কি কথা হইয়াছিল?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিল। শুনিয়া চন্দ্রশেখর মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন?"

শৈ। বাসমাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চ। বাস মাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী?

শৈ। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এজন্য আমি সাধ্বী নহি—মহাপাপিষ্ঠা।

চ। নচেৎ? শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

চ। ফষ্টর সম্বন্ধে? শৈ। কায়মনোবাক্যে।

চন্দ্রশেখর খর খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত-সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "সত্য বল।"

নিদ্রিতা যুবতী ভ্রূকুঞ্চিত করিল, বলিল—"সত্যই বলিয়াছি।"

চন্দ্রশেখর আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "তবে ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া জাতিভ্রষ্টা হইতে গেলে কেন?"

শৈ। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। বলুন, আমি জাতিভ্রষ্টা কি না? আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে—কিন্তু গঙ্গার উপর।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন;—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম।" ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন?"

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

চ। এ সকল কথা কে জানে?

শৈ। ফষ্টর আর পার্ব্বতী। চ। পার্ব্বতী কোথায়?

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

চ। ফষ্টর কোথায়?

শৈ। উদয়নালায় নবাবের শিবিরে।

চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রোগের কি প্রতিকার হইবে—বুঝিতে পার?"

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদে জানিতে পারিতেছি—আপনার শ্রীচরণকৃপায়, আপনার ঔষধে আরোগ্য লাভ করিব।

চ। আরোগ্য লাভ করিলে কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর?

শৈ। যদি বিষ পাই ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ। মরিতে চাও কেন?

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

চ। কেন, আমার গৃহে?

শৈ। আপনি আর গ্রহণ করিবেন? চ। যদি করি?

শৈ। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি। কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল নাই, রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছ,—বল ও কিসের শব্দ?"

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ। চ। কে আসিতেছে?

শৈ। মহম্মদ ইর্‌ফান্—নবাবের সৈনিক।

চ। কেন আসিতেছে?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

চ। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন না তৎপূর্ব্বে?

শৈ। না। দুইজনকে আনিতে এক সময়ে আদেশ করেন।

চ। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে ডাকিলেন। তাঁহারা আসিলে বলিলেন যে, "এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি, নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।"

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এখনই শুনিবে, চিন্তা নাই।"

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ আসিলে, প্রতাপ তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর আদ্যোপান্ত সকল কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে গোপনে নিবেদিত করিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আগামী কল্য আমাদের দুই জনকেই নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দরবারে।

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছেন—শেষ রাজা, কেন না, মীরকাসেমের পর যাঁহারা বাঙ্গালার নবাব নামধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।

বার দিয়া মুক্তাপ্রবালরজতকাঞ্চনশোভিত উচ্চাসনে, নবাব কাসেম আলি খাঁ, মুক্তাহীরকমণ্ডিত হইয়া, শিরোদেশে উষ্ণীষোপরি উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরকখণ্ড রঞ্জিত করিয়া, দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভৃত্যবর্গ যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া, নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দিগণ উপস্থিত?"

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ বলিলেন, "সকলেই উপস্থিত।" নবাব, প্রথমে লরেন্স্‌ ফষ্টরকে আনিতে বলিলেন।

লরেন্স্‌ ফষ্টর আনিত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিল যে, এবার নিস্তার নাই। এক কালের পর ভাবিল, এতকাল ইংরেজ নামে কালী দিয়াছি – এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব। "আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।"

নবাব। তুমি কোন জাতি? ফষ্টর। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু—তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সে জন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন্—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিলেন; বলিলেন, "জানিলাম, তুমি ভয়শূন্য। সত্য কথা বলিতে পারিবে?"

ফ। ইংরেজ কখন মিথ্যা বলে না।

ন। বটে? তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইর্‌ফান্ চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কহিলেন, "ইহাকে চেন?" ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল বাঁদী কুল্‌সম্ কোথায়? কুল্‌সম্‌ও আসিল।

নবাব ফষ্টরকে কহিলেন, "এই বাঁদীকে চেন?"

ফ। চিনি। ন। কে এ?

ফ। আপনার দাসী। ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইর্‌ফান্, তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ এত দিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন পক্ষে যাই, এই জন্য শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতি চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি ইব্রাহিম্ খাঁ অনায়াসে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, 'কুলসম্! বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে?"

কুল্‌সম্ আনুপূর্ব্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে, সজল-নয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে

লাগিল—"জাঁহাপনা! আমি এই আমদরবারে, এই পাপিষ্ঠ স্ত্রী-ঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন। সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকা-বৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।"

মহম্মদ তকি, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?"

কুল্‌সম্, বিস্ফারিতলোচনে গর্জ্জন করিয়া বলিল—"আমার সাক্ষী। উপরে চাহিয়া দেখ—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর! আপনার বুকের উপর হাত দে—আমার সাক্ষী তুই। যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিঙ্গিকে জিজ্ঞাসা কর।"

ন। কেমন ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।

ফষ্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল, দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহার একজন সাক্ষী। আমি সেই ব্রহ্মচারী।"

কুল্‌সম্ তখন চিনিল। বলিল, "ইনিই বটে।"

তখন চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন, "রাজন, যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা কথা প্রশ্ন করুন।"

নবাব বুঝিলেন,—বলিলেন, "তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।"

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিয়াছ, চন্দ্রশেখর নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর! তুমি তাহার—"

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ফষ্টর বলিল,—"আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমি স্বাধীন—মরণ ভয় করি না। এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

নবাব অনুমতি করিলেন, "তবে শৈবলিনীকে আন। শৈবলিনী আনিতা হইল। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্ন, শীর্ণা, মলিনা—জীর্ণ-সঙ্কীর্ণ-বাসপরিহিতা—অরঞ্জিতকুন্তলা—ধূলিধূসরা। গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি,—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক দৃষ্টি। ফষ্টর শিহরিল,—

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন ?" ফ। চিনি।

ন। এ কে ? ফ। শৈবলিনী,—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে ?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে—অনুমতি করুন। আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুরদংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল—হস্ত-পদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল—বলিল, "আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়—অন্য প্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন।"

ন। না। এ দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিংবদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে—তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুরে দংশন করিলে, ক্ষতমুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুক্কুরেরা মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায় অর্দ্ধভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধমৃত হইয়া প্রোথিত থাকে—কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুই বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত্ত পশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফষ্টর জানু পাতিয়া ভূমে বসিয়া, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনয়নে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল—মনে মনে বলিতে লাগিল, 'আমি কখনও তোমাকে ডাকি নাই, কখনও তোমাকে ভাবি নাই, চিরকাল পাপই করিয়াছি। তুমি যে আছ, তাহা কখনও মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে ডাকিতেছি—হে নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! আমায় রক্ষা কর!"

কেহ বিশ্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে। ফষ্টরও ডাকিল।

নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাম্বুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজূটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রু-বিভূষিত, বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। ফষ্টর সেই চক্ষু প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে আত্মার চিত্ত দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই জটাজূটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজলজলদগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফষ্টর শুনিল, যেন কেহ বলিতেছে, "আমি তোকে কুক্কুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার ?

ফষ্টর একবার সেই ধূলিধূসরিতা উন্মাদিনীর প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল—'না।'"

সকলেই শুনিল, "না ! আমি শৈবলিনীর জার নহি।"

সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল। নবাব প্রশ্ন করিলেন, কি চন্দ্রশেখর, কি কে করিল, ফষ্টর তাহা বুঝিতে পারিল না—কেবল শুনিল যে, গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল, "তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন ?"

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে; সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই, কখনও তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ কথা শুনিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে ?"

ফষ্টর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই। সে নিজে রাঁধিত।"

প্রশ্ন—"কি রাঁধিত?" ফষ্টর—"কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু খাইত না।" প্রশ্ন। "জল?"

ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।" এমন সময়ে সহসা—শব্দ হইল, "ধুরুম্ ধুরুম্ ধুম্ ধুম্! নবাব বলিলেন, "ও কি ও?"

ইর্‌ফান্ কাতরস্বরে, বলিল, ' আর কি? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।

সহসা তাম্বু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। "দুড়ুম দুড়ুম দুম্" আবার কামান গর্জ্জিতে লাগিল। আবার! বহুতর কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল—ভীম নাদ লক্ষে লক্ষে নিকটে আসিতে লাগিল—রণবাদ্য বাজিল—চারিদিক্ হইতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। অশ্বের পদাঘাত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—ধুমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইল—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সুষুপ্তিকালে যেন জলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ এবং ভৃত্যগণ ঠেলাঠেলি করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্‌সম, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফষ্টর ইহারাও বাহির হইল। তাম্বু-মধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধক্ষেত্রে।

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমা-

নন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর! অতঃপর কি করিবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এক্ষণে শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে? চারিদিকে গোলা-বৃষ্টি হইতেছে। চারিদিক্ ধূমে অন্ধকার—কোথায় যাইব?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "চিন্তা নাই,—দেখিতেছ না, কোন্ দিকে যবন সেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান—বলবান—এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ হয়, ইহারা এক দিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল, আমরা পলায়নপর যবনদিগের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হই। তোমার আমার জন্য চিন্তা নাই; কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।"

তিন জনে পলায়নোদ্যত যবনসেনার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে একদল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা—রণমত্ত হইয়া দৃঢ় পর্ব্বতরন্ধ্রপথে নির্গত হইয়া ইংরেজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে, তাহাদিগের নায়ক, অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে, প্রতাপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বিমনা হইলেন; কিঞ্চিৎ পরে বিমনা হইয়া বলিলেন, "প্রতাপ! এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের।"

"আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।"

এই বলিয়া প্রতাপ, তিন জনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। তিনি পর্ব্বতমালামধ্যস্থ নির্গমনপথ-সকল সবিশেষ অবগত ছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে সমর-ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর বলিলেন, "প্রতাপ, তুমি ধন্য, তুমি যাহা জান, আমিও তাহা জানি।"

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখর বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,

তবে তাহা করিব। করিয়া ইহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

প্র। কেন, স্বামী? ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই।

চ। এ পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া, হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিল—

প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, "আমার একটা কথা কানে কানে শুনিবে? আমি দূষণীয় কিছুই বলিব না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তোমার বাতুলতা না কৃত্রিম?"

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছিলাম?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "চুপ। এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব—কিন্তু তোমার অনুমতিসাপেক্ষ।"

প্র। আমার অনুমতি কেন?

শৈ। স্বামী যদি আমায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়? প্র। কি করিতে চাও!

শৈ। পূর্ব্বকথা-সকল তাঁহাকে বলিয়া, ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "বলিও! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও!" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই— প্র। সে কি শৈবলিনী?

শৈ। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন

বশে থাকিবে জানি না। এজন্যে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিল না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাত পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। গমনকালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা যাও? প্রতাপ বলিলেন, "যুদ্ধে।"

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "ফষ্টর এখনও জীবিত আছে। তাহার বধে চলিলাম।"

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিলেন; বলিলেন, "ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন! তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে!"

প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখনও লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?"

প্রতাপ, মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া রামানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, 'তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। দুই একদিন পরে সাক্ষাৎ হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি।" রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময়, আহতের আর্ত্তচীৎকারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে স্বতঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব স্তূপাকৃত হইয়াছে—কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ "জল! জল!" করিয়া, আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা, ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দ স্বামী সেই সকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত অশ্বারোহী রুধিরাক্ত কলেবরে আহত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, অস্ত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত যোদ্ধৃবর্গ দলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত পদাতিক, রিক্তহস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে, রক্তপ্লাবিত হইয়া পলাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না।

শ্রান্ত হইয়া রমানন্দ স্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেইখান দিয়া একজন সিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই পলাইতেছ—তবে যুদ্ধ করিল কে?"

সিপাহী বলিল, "কেহ নহে। কোন এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথা?" সিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া সিপাহী পলাইল।

রমানন্দ স্বামী গড়ের দিকে গেলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ নাই। কয়েকজন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্র স্তূপাকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী, তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন, দেখিলেন, সেই প্রতাপ! আহত, মৃতপ্রায়, এখনও জীবিত।

রমানন্দ স্বামী, জল আনিয়া তাঁহার মুখে দিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্য হস্তোত্তোলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

স্বামী বলিলেন, "আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আরোগ্য লাভ কর।"

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, "আরোগ্য? আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নাই। আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।"

রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জ্জয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?"

প্রতাপ বলিল, "আপনি কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন?"

স্বামী বলিলেন, "যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তখন তাহার আকারেঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে এবং বোধ হয়, তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতিপাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই, আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত কখনও না কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল; আর কেহ কখনও রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার

এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে ?"

সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল—"কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি, শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এইজন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারি। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

রমানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণ-শয্যায়, অনিন্দ্য জ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে

[illegible] নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও। লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।

সমাপ্ত।

যুগলাঙ্গুরীয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুই জনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন প্রাচীন নগর তাম্রলিপ্তের * চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।

তাম্রলিপ্ত নগরের প্রান্তভাগে সমুদ্রতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। তাহার নিকট একটি সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা। বৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী। শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ঈপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চদশবৎসর, এই সমুদ্রতীরবাসিনী সাগরেশ্বরী নাম্নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই। প্রাপ্তযৌবনা কুমারী কেন যে এই যুবার সঙ্গে একা কথা কহেন, তাহা সকলেই জানিত। হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসর। ইহাঁর পিতা শচীসুত শ্রেষ্ঠী ধনদাসের প্রতিবাসী, এজন্য উভয়ে একত্র বাল্যক্রীড়া করিতেন। হয় শচীসুতের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে, সর্ব্বদা একত্র সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স যোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, তথাপি উভয়ের সেই বাল্যসখিত্ব সম্বন্ধই ছিল। একটু মাত্র বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। যথাবিহিত কালে উভয়ের পিতা, এই যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন-স্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।" সেই

* আধুনিক তাম্রলুক। পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে এই নগর সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল।

অবধি হিরণ্ময়ী আর পুরন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন না। অদ্য পুরন্দর অনেক বিনয় করিয়া, বিশেষ কথা আছে বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। লতামণ্ডপতলে আসিয়া হিরণ্ময়ী কহিল "আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে? আমি এক্ষণে আর বালিকা নহি, এখন আর তোমার সঙ্গে এমত স্থানে একা সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায় না। আর ডাকিলে আসিব না।"

ষোল বৎসরের বালিকা বলিতেছে, "আমি আর বালিকা নহি" ইহা বড় মিষ্ট কথা। কিন্তু সে রস অনুভব করিবার লোক সেখানে কেহই ছিল না। পুরন্দরের বয়স বা মনের ভাব সেরূপ নহে।

পুরন্দর মণ্ডপবিলম্বিত লতা হইতে একটি পুষ্প ভাঙ্গিয়া লইয়া ছিন্ন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি আর ডাকিব না। আমি দূরদেশে চলিলাম। তাই তোমাকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।"

হি। দূরদেশে? কোথায় পু। সিংহলে।

হি। সিংহলে? সে কি? কেন সিংহলে যাইবে?

পু। কেন যাইব? আমরা শ্রেষ্ঠী—বাণিজ্যার্থ যাইব। বলিতে বলিতে পুরন্দরের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী বিমনা হইলেন। কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষ-লোচনে সম্মুখবর্ত্তী সাগরতরঙ্গে সূর্য্যকিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃদুপবন বহিতেছে—মৃদুপবনোত্থিত অতুঙ্গতরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগর-জলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষি-কুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন,—নীলজল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন,—দূরবর্ত্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণ-বিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন শেষে ভূতলশায়ী একটি শুষ্ক কুসুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন,—

"তুমি কেন যাবে—অন্যান্যবার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন।"

পুরন্দর বলিল, "আমার পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি।"

হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপের কাষ্ঠে ললাট রক্ষা করিলেন। পুরন্দর দেখিলেন,তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছে,অধর স্ফুরিত হইতেছে, নাসিকারন্ধ্র স্ফীত হইতেছে। দেখিলেন যে,হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর মুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রহিল না।—চক্ষুর জল গণ্ড বহিয়া পড়িল। পুরন্দর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার পিতা বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই দিন হইতেই আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে যে, সিংহল হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি, তবেই ফিরিব। আমি অধিক কথা বলিতে জানি না, তুমিও অধিক কথা বুঝিতে পারিবে না। ইহা বুঝিতে পারিবে যে, আমার পক্ষে জগৎসংসার একদিকে, তুমি এক দিকে হইলে, জগৎ তোমার তুল্য নহে।" এই বলিয়া পুরন্দর হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া পাদচারণ করিয়া অন্য একটা বৃক্ষের পাতা ছিঁড়িলেন। অশ্রুবেগ কিঞ্চিত শমিত হইল, ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিলেন, "তুমি আমায় ভালবাস, তাহা জানি। কিন্তু যবে হউক, অন্যের পত্নী হইবে। অতএব তুমি আর আমায় মনে রাখিও না। তোমার সঙ্গে যেন এ জন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়।"

এই বলিয়া পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্ময়ী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোদন সংবরণ করিয়া একবার ভাবিলেন, "আমি যদি আজি মরি, তবে কি পুরন্দর সিংহলে যাইতে পারে? আমি কেন গলায় লতা বাঁধিয়া মরি না—কিম্বা সমুদ্রে ঝাঁপ দিই না?" আবার ভাবিলেন, আমি যদি মরিলাম, তবে পুরন্দর সিংহলে যাক না যাক, তাতে আমার কি?" এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ী আবার কাঁদিতে বসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কেন যে ধনদাস বলিয়াছিলেন যে, "আমি পুরন্দরের সঙ্গে হিরণের বিবাহ দিব না," তাহা কেহ জানিত না। তিনি তাহা

তাঁহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "বিশেষ কারণ আছে।" হিরণ্ময়ীর অন্যান্য অনেক সম্বন্ধ আসিল —কিন্তু ধনদাস কোন সম্বন্ধেই সম্মত হইলেন না। বিবাহের কথামাত্রে কর্ণপাত করিতেন না। "কন্যা বড় হইল" বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করিতেন; ধনদাস শুনিতেন না। কেবল বলিতেন, "গুরুদেব আসুন—তিনি আসিলে এ কথা হইবে।"

পুরন্দর সিংহলে গেলেন। তাঁহার সিংহলযাত্রার পর দুই বৎসর এইরূপে গেল। পুরন্দর ফিরিলেন না। হিরণ্ময়ীর কোন সম্বন্ধ হইল না। হিরণ অষ্টাদশ বৎসরের হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ নবপল্লবিত চূতবৃক্ষের ন্যায় ধনদাসের গৃহ শোভা করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী ইহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। বিবাহের কথা হইলে পুরন্দরকে মনে পড়িত; তাঁহার সেই ফুল্ল কুসুমমালামণ্ডিত কুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তলাবলীবেষ্টিত সহাস্য মুখমণ্ডল মনে পড়িত, তাঁহার সেই দ্বিরদশুভ্র স্কন্ধদেশে স্বর্ণপুষ্পশোভিত নীল উত্তরীয় মনে পড়িত; পদ্মহস্তে হীরকাঙ্গুরীয়গুলি মনে পড়িত; হিরণ্ময়ী কাঁদিতেন। পিতার আজ্ঞা হইলে যাহাকে তাহাকে বিবাহ করিতে হইত। কিন্তু সে জীবন্মৃত্যুবৎ হইত। তবে তাঁহার বিবাহোদ্যোগে পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া, আহ্লাদিত হউন বা না হউন, বিস্মিতা হইতেন। লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিতা রাখে না—রাখিলেও তাহার সম্বন্ধ করে। তাঁহার পিতা সে কথায় কর্ণ পর্য্যন্ত দেন না কেন? একদিন অকস্মাৎ এ বিষয়ের কিছু সন্ধান পাইলেন।

ধনদাস বাণিজ্যহেতু চীনদেশে নির্ম্মিত একটী বিচিত্র কৌটা পাইয়াছিলেন। কৌটা অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাহাতে অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস কতকগুলি নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন শ্রেষ্ঠিপত্নী পুরাতন অলঙ্কারগুলি কৌটাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলি রাখা ঢাকা করিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন যে, তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে।

হিরণ্ময়ী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম দেখিতে পাইয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন যে, যে

অর্দ্ধাংশ আছে, তাহাতে কোন অর্থবোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু তথাপি তাহা পড়িয়া হিরণ্ময়ীর মহাভীতিসঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্রখণ্ড এইরূপ—

"জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাংহিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলি বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ্। সব মুখ পরস্পরে হইতে পারে।"

হিরণ্ময়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া পত্রখণ্ড তুলিয়া রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসরের পর আরও এক বৎসর গেল,তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে আসার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কিন্তু হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, পুরন্দরও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই—নচেৎ এতদিন ফিরিতেন।

এইরূপে দুই আর একে তিন বৎসর গেলে, অকস্মাৎ একদিন ধনদাস বলিলেন, যে, "চল, সপরিবারে কাশী যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য আসিয়াছেন। গুরুদেব সেইখানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইবে। সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন।"

ধনদাস পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশী-যাত্রা করিলেন। উপযুক্তকালে কাশীতে উপনীত হইলে পর ধনদাসের গুরু আনন্দস্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন; এবং বিবাহের দিনস্থির করিয়া যথাশাস্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন।

বিবাহের যথাশাস্ত্র উদ্যোগ হইল, কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না ধনদাসের পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে, বিবাহ উপস্থিত। কেবল শাস্ত্রীয় আচারসকল রক্ষা করা হইল মাত্র।

বিবাহের দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল—এক প্রহর রাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে যাহারা সচরাচর থাকে, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ নাই। প্রাতিবাসীরাও কেহ উপস্থিত নাই। এ পর্য্যন্ত ধনদাস ভিন্ন গৃহস্থ

কেহও জানে না যে, কে পাত্র—কোথাকার পাত্র। তবে সকলেই জানিত যে, যেখানে আনন্দস্বামী বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থির করেন নাই। তিনি যে কেন পাত্রের পরিচয় ব্যক্ত করিলেন না, তাহা তিনিই জানেন—তাঁহার মনের কথা বুঝিবে কে? একটী গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাস একাকী বরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে কন্যা-সজ্জা করিয়া হিরণ্ময়ী বসিয়া আছেন—আর কোথাও কেহ নাই। হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"এ কি রহস্য! কিন্তু পুরন্দরের সঙ্গে যদি বিবাহ না হইল—তবে যে হয় তাহার সঙ্গে বিবাহ হউক—সে আমার স্বামী হইবে না।"

এমন সময়ে ধনদাস কন্যাকে ডাকিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষু দৃঢ়তর বাঁধিলেন। হিরণ্ময়ী কহিলেন, "এ কি পিতা?" ধনদাস কহিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞা। তুমিও আমার আজ্ঞামত কার্য্য কর। মন্ত্রগুলি মনে মনে বলিও।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইয়া যদি কেহ দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে দেখিতেন যে, পাত্রও তাহার ন্যায় চক্ষুবন্ধনযুক্ত। এইরূপে বিবাহ হইল। সেখানে গুরু পুরোহিত এবং কন্যাকর্ত্তা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বরকন্যা কেহ কাহাকে দেখিলেন না। শুভদৃষ্টি হইল না।

সম্প্রদানান্তে আনন্দস্বামী বরকন্যাকে কহিলেন যে, "তোমাদিগের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে দেখিলে না। কন্যার কুমারী নাম ঘুচানই এই বিবাহের উদ্দেশ্য, ইহজন্মে কখন তোমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে কি না, বলিতে পারি না। যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে না। চিনিবার আমি একটী উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে দুইটী অঙ্গুরীয় আছে। দুইটী ঠিক এক প্রকার। অঙ্গুরীয় যে প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা

পাওয়া যায় না; এবং অঙ্গুরীয়ের ভিতরের পৃষ্ঠে একটী ময়ূর অঙ্কিত আছে। ইহার একটী বরকে একটী কন্যাকে দিলাম। এরূপ অঙ্গুরীয় অন্য কেহ পাইবে না বিশেষ এই ময়ূরের চিত্র অননুকরণীয়। ইহা আমার স্বহস্তখোদিত। যদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, সেই পুরুষ তাঁহার স্বামী। যদি বর কখন কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, তিনিই তাঁহার পত্নী। তোমরা কেহ এ অঙ্গুরীয় হারাইও না, বা কাহাকেও দিও না, অন্নাভাব হইলেও বিক্রয় করিও না। কিন্তু ইহাও আজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য হইতে পঞ্চবৎসরমধ্যে কদাচ এই অঙ্গুরীয় পরিও না। অদ্য আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী, রাত্রি একাদশ দণ্ড হইয়াছে, ইহার পর পঞ্চম আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীর একাদশ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত অঙ্গুরীয়ব্যবহার নিষেধ করিলাম। আমার নিষেধ অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল হইবে।"

এই বলিয়া আনন্দস্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিলেন। হিরণ্ময়ী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে, গৃহমধ্যে কেবল পিতা ও পুরোহিত আছেন—তাঁহার স্বামী নাই। তাঁহার বিবাহরাত্রি একাই যাপন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহান্তে ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। পুরন্দর ফিরিয়া আসিলেন না—হিরণ্ময়ীর পক্ষে এখন ফিরিলেই কি, না ফিরিলেই কি?

পুরন্দর যে এই সাত বৎসরে ফিরিল না, ইহা ভাবিয়া হিরণ্ময়ী দুঃখিতা হইলেন। মনে ভাবিলেন, "তিনি যে আজিও আমায় ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া আসিলেন না, এমত কদাচ সম্ভবে না। তিনি জীবিত আছেন কি না সংশয়। তাঁহার দেখার আমি কামনা করি না, এখন আমি অন্যের স্ত্রী; কিন্তু আমার বাল্যকালের সুহৃৎ বাঁচিয়া থাকুন, এ কামনা কেন না করিব?"

ধনদাসেরও কোন কারণে না কোন কারণে চিন্তিত ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল; ক্রমে চিন্তা গুরুতর হইয়া শেষে দারুণ রোগে পরিণত হইল। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। ধনদাসের পত্নী অনুমৃতা হইলেন। হিরণ্ময়ীর আর কেহ ছিল না, এজন্য হিরণ্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন যে, "তুমি মরিও না।" কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী শুনিলেন না। তখন হিরণ্ময়ী পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন।

মৃত্যুকালে হিরণ্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, "বাছা, তোমার কিসের ভাবনা? তোমার একজন স্বামী অবশ্য আছেন। নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয়, তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান—ধন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল।"

কিন্তু সে আশা বিফল হইল—ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই। অলঙ্কার, অট্টালিকা এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনুসন্ধানে হিরণ্ময়ী জানিলেন যে ধনদাস কয়েক বৎসর হইতে বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি তাহা কাহাকেও না বলিয়া শোধনের চেষ্টায় ছিলেন। ইহাই তাঁহার চিন্তার কারণ। শেষে শোধনও অসাধ্য হইল। ধনদাস মনের ক্লেশে পীড়িত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সকল সংবাদ শুনিয়া অপরাপর শ্রেষ্ঠীরা আসিয়া হিরণ্ময়ীকে কহিল যে, "তোমার পিতা আমাদের ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছেন। আমাদিগের ঋণ পরিশোধ কর।" শ্রেষ্ঠিকন্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের কথা যথার্থ। তখন হিরণ্ময়ী সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন।

এখন হিরণ্ময়ী অন্নবস্ত্রের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া নগরপ্রান্তে এক কুটীরমধ্যে একা বাস করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এক সহায় পরম হিতৈষী আনন্দস্বামী, কিন্তু তিনি তখন দূরদেশে ছিলেন।

হিরণ্ময়ীর এমন একটী লোক ছিল না যে, আনন্দস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ী যুবতী এবং সুন্দরী—একাকিনী এক গৃহে শয়ন করা ভদ্র নহে। আপদও আছে—কলঙ্কও আছে। অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল। সে বিধবা—তাহার একটী কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটী কন্যা। তাহার যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। হিরণ্ময়ী রাত্রিতে আসিয়া তাহার গৃহে শয়ন করিতেন।

একদিন হিরণ্ময়ী অমলার গৃহে শয়ন করিতে আসিলে পর, অমলা তাহাকে কহিল, "সংবাদ শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী না কি আট বৎসরের পর নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী মুখ ফিরাইলেন—চক্ষুর জল অমলা না দেখিতে পায়। পুরন্দরের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর শেষ সম্বন্ধ ঘুচিল। পুরন্দর তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। নচেৎ ফিরিত না। পুরন্দর এক্ষণে মনে রাখুক বা ভুলুক, তাঁহার লাভ বা ক্ষতি কি? তথাপি যাহার স্নেহের কথা ভাবিয়া যাবজ্জীবন কাটাইয়াছেন, সে ভুলিয়াছে ভাবিতে হিরণ্ময়ীর মনে কষ্ট হইল। হিরণ্ময়ী একবার ভাবিলেন—"ভুলেন নাই—কতকাল আমার জন্য বিদেশে থাকিবেন? বিশেষ তাহাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—আর দেশে না আসিলে চলিবে কেন?" আবার ভাবিলেন, "আমি কুলটা সন্দেহ নাই—নহিলে পুরন্দরের কথা মনে করি কেন?"

অমলা কহিল, "পুরন্দরকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীসুত শ্রেষ্ঠীর ছেলে।" হি। চিনি।

অ। তা সে ফিরে এসেছে—কত নৌকা যে ধন এনেছে, তাহা শুনে, সংখ্যা করা যায় না। এত ধন না কি এ তাম্রলিপ্তে কেহ কখন দেখে নাই।

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্যদশা মনে পড়িল, পূর্ব্ব সম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা।

তাহার পরিবর্ত্তে এই অতুল ধনরাশি হিরণ্ময়ী হইতে পারিত ইহা ভাবিয়া যাহার খর রক্ত না বহে, এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরণ্ময়ী ক্ষণেককাল অন্যমনে থাকিয়া পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়নকালে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলা সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?" অমলা কহিল, "না, বিবাহ হয় নাই।"

হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয়-সকল অবশ হইল। সে রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরে একদিন অমলা হাসিমুখে হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিয়া মধুর ভৎসনা করিয়া কহিল, "হাঁ গা বাছা, তোমার কি এমনই ধর্ম্ম?"

হিরণ্ময়ী কহিল, "কি করিয়াছি?"

অম। আমার কাছে এতদিন তা বলিতে নাই?

হি। কি বলি নাই?

অম। পুরন্দর শেঠীর সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা!

হিরণ্ময়ী ঈষল্লজ্জিতা হইলেন; বলিলেন, তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী ছিলেন—তার বলিব কি?"

অম। শুধু প্রতিবাসী? দেখ দেখি কি এনেছি!

এই বলিয়া অমলা একটী কোটা বাহির করিল কোটা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে অপূর্ব্বদর্শন, মহাপ্রভাযুক্ত, মহ মূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠিকন্যা হীরা চিনিত— বিস্মিতা হইয়া কহিল, "এ যে মহামূল্য এ কোথায় পাইলে?"

অম। ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। তুমি আমার গৃহে থাক শুনিয়া, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহ তোমাকে দিতে বলিয়াছে।

হীরণ্ময়ী ভাবিয়া দেখিল, এই হার গ্রহণ করিলে চিরকাল জন্য দারিদ্র্য-মোচন হয়। ধনদাসের আদরের কন্যা আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহিতে পারিতেছিল না। অতএব হিরণ্ময়ী ক্ষণেক বিমনা হইল। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "অমলা, তুমি বণিক্‌কে কহিও যে, আমি ইহা গ্রহণ করিব না।"

অমলা বিস্মিতা হইল। বলিল, "সে কি? তুমি কি পাগল, না আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না?"

হি। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতেছি—আর পাগলও নই। আমি উহা গ্রহণ করিব না।

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন অমলা হার লইয়া রাজা মদনদেবের নিকটে গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া হার উপহার দিল। বলিল, "এ হার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার আপনারই যোগ্য।" রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই জানিল না।

ইহার কিছুদিন পরে পুরন্দরের একজন পরিচারিকা হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিল। সে কহিল, "আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণকুটীরে বাস করেন, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। আপনি তাঁহার বাল্যকালের সখী; আপনার গৃহ তাঁহার গৃহ একই। তিনি এমন বলেন না যে, আপনি তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করুন আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা আপনাকে দান করিতেছেন। আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা।"

হিরণ্ময়ী দারিদ্র্যজন্য যত দুঃখভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পিতৃভবন হইতে নির্ব্বাসনই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে পিতামাতার সহবাস করিতেন, যেখানে তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে আর বাস করিতে পান না, এ কষ্ট গুরুতর বোধ হইত। সেই ভবনের কথায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল তিনি পরিচারিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ দান আমার গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু আমি এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোমার প্রভুর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক!"

পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। অমলা উপস্থিত ছিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, "অমলা, তথায় আমার একা বাস করা হইতে পারে না। তুমিও তথায় বাস করিবে চল।"

অমলা স্বীকৃত হইল। উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাপি অমলাকে সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাইতে হিরণ্ময়ী এক-দিন নিষেধ করিলেন। অমলা আর যাইত না।

পিতৃগৃহে গমনাবধি হিরণ্ময়ী একটা বিষয়ে বড় বিস্মিতা হই-লেন। একদিন অমলা কহিল, "তুমি সংসারনির্ব্বাহের জন্য ব্যস্ত হইও না, বা শারীরিক পরিশ্রম করিও না। রাজবাড়ী আমার কার্য্য হইয়াছে—আর এখন অর্থের অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব—তুমি সংসারে কর্ত্রী হইয়া থাক।" হিরণ্ময়ী দেখিলেন, অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য। মনে মনে নানা প্রকার সন্দিহান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর পঞ্চমাষাড়ের শুক্লা পঞ্চমী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী এ কথা স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিয়াছেন ভাবিতেছিলেন, 'গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অঙ্গুরীয়টী পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি? পরিলে আমার কি লাভ? হয় ত স্বামী পাইব, কিন্তু স্বামী পাইবার আমার বাসনা নাই। অথবা চিরকালের জন্য কেনই বা পরের মূর্ত্তি মনে আঁকিয়া রাখি? এ দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত। নহিলে ধর্ম্মে পতিত হইতেছি।"

এমন সময়ে অমলা বিস্ময়বিহ্বলা হইয়া আসিয়া কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে!" হি। কি হইয়াছে?

অ। রাজপুরী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাস-দাসী আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে।

হি। তুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন?

এমন সময়ে রাজদূতী আসিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল যে, "রাজাধিরাজ পরম ভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে হিরণ্ময়ী এই

মুহূর্ত্তেই শিবিকারোহণে রাজাবরোধে যাইবেন।"

হিরণ্ময়ী বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য বিশেষ রাজা মদনদেবের অনুরোধে যাইতে কোন শঙ্কা নাই। রাজা পরমধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত, তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে না।

হিরণ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, "অমলা, আমি রাজদর্শনে যাইতে সম্মতা। তুমি সঙ্গে চল।" অমলা স্বীকৃতা হইল।

তৎসমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে হিরণ্ময়ী রাজাবরোধমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। প্রতিহারী রাজাকে নিবেদন করিল যে, শ্রেষ্ঠি-কন্যা আসিয়াছে। রাজাজ্ঞা পাইয়া প্রতিহারী একা হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ী রাজাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। রাজা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, কবাটবক্ষ; দীর্ঘহস্ত; অতি সুগঠিত আকৃতি, ললাট প্রশস্ত বিস্ফারিত, আয়ত চক্ষু; শান্তমূর্ত্তি—এইরূপ সুন্দর পুরুষ কদাচিৎ স্ত্রীলোকের নয়নপথে পড়ে। রাজাও শ্রেষ্ঠিকন্যাকে দেখিয়া জানিলেন যে, রাজাবরোধেও এরূপ সুন্দরী দুর্লভ।

রাজা কহিলেন, "তুমি হিরণ্ময়ী?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমি আপনার দাসী।"

রাজা কহিলেন, "কেন তোমাকে ডাকাইয়াছি, তাহা শুন। তোমার বর্বহের কথা মনে পড়ে?" হি। পড়ে।

রাজা। সেই রাত্রে আনন্দস্বামী তোমাকে যে অঙ্গুরী দিয়াছিলেন, তাহা তোমার কাছে আছে?

হি। মহারাজ! সে অঙ্গুরীয় আছে। কিন্তু সে সকল অতি গুহ্য বৃত্তান্ত, কি প্রকারে আপনি তাহা অবগত হইলেন?

রাজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "সে অঙ্গুরীয় কোথায় আছে? আমাকে দেখাও।"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "উহা আমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। পঞ্চ-বৎসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলম্ব আছে—অতএব তাহা পরিতে আনন্দস্বামীর যে নিষেধ ছিল—তাহা এখনও আছে।"

রাজা। ভালই—কিন্তু সেই অঙ্গুরীয়ের অনুরূপ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীয় তোমার স্বামীকে আনন্দস্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে?

হি। উভয় অঙ্গুরীয় একই রূপ; সুতরাং দেখিলে চিনিতে পারিব।

তখন প্রতিহারী রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এক সুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজা তাহার মধ্য হইতে একটী অঙ্গুরীয় লইয়া বলিলেন, "দেখ, এই অঙ্গুরীয় কাহার?"

হিরণ্ময়ী অঙ্গুরীয় প্রদীপালোকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "দেব! এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীয় বটে, কিন্তু আপনি ইহা কোথায় পাইলেন?" পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেব! ইহাতে জানিলাম যে, আমি বিধবা হইয়াছি। স্বজনহীন মৃতের ধন আপনার হস্তগত হইয়াছে। নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ইহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ।"

হি। তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। ধন-লোভে ইহা বিক্রয় করিয়াছেন।

রা। তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি।

হি। তবে আপনি বলে ছলে কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে ইহা অপহরণ করিয়াছেন।

রাজা এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তোমার বড় সাহস! রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে না।"

হি। নচেৎ আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন?

রা। আনন্দস্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কহিলেন, "আর্য্যপুত্র

আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—আমি চপলা, না জানিয়া কটু কথা বলিয়াছি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ী রাজমহিষী, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু কিছুমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন না। বরং বিষণ্ণা হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, "আমি এতদিন পুরন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্তু পরপত্নীত্বের যন্ত্রনাভোগ করি নাই। এখন হইতে আমার সে যন্ত্রনা আরম্ভ হইল। আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরের পত্নী—কি প্রকারে অন্যানুরাগিণী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব?" হিরণ্ময়ী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা বলিলেন, "হিরণ্ময়ী! তুমি আমার মহিষী বটে, কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বিনা মূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর কেন?"

হিরণ্ময়ী অধোবদন হইলেন। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাসী অমলা সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাতায়াত করে কেন?"

হিরণ্ময়ী আরও লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন; ভাবিতে-ছিলেন, "রাজা মদনদেব কি সর্ব্বজ্ঞ?"

তখন রাজা কহিলেন, "আর একটি গুরুতর কথা আছে। তুমি পরনারী হইয়া পুরন্দরের প্রেরিত হীরকহার গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?"

এবার হিরণ্ময়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, জানি-লাম, আপনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। হীরকহার আমি ফিরাইয়া দিয়াছি!"

রাজা। তুমি সেই হার আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। এই দেখ সেই হার।

এই বলিয়া রাজা কৌটার মধ্য হইতে হার বাহির করিয়া দেখাইলেন। হিরণ্ময়ী হীরকহার চিনিতে পারিয়া বিস্মিতা হইলেন। কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, এ হার কি আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে বিক্রয় করিয়াছি?" রা। না, তোমার দাসী বা দূতী অমলা আসিয়া বিক্রয় করিয়াছে। তাহাকে ডাকাইব?

হিরণ্ময়ীর অমর্ষান্বিত বদনমণ্ডলে একটু হাসি দেখা দিল।

বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! অপরাধ ক্ষমা করুন। অবলাকে জ্বালা- 'ইতে হইবে না—আমি এ বিক্রয় স্বীকার করিতেছি।"

এবার রাজা বিস্মিতা হইলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের চরিত্র অভাবনীয়। তুমি পরের পত্নী হইয়া পুরন্দরের নিকট কেন হার গ্রহণ করিলে?"

হি। প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা আরও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? কি প্রকারে প্রণয়োপহার?"

হি। আমি কুলটা। মহারাজ! আমি আপনার গ্রহণের যোগ্যা নহি। আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন।

হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে রাজার বিস্ময়বিকাশক মুখকান্তি অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী ফিরিল।

রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ী! তুমিই জিতিলে,—আমি হারিলাম। তুমিও কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি। যাইও না।"

হি। মহারাজ! তবে এ কাণ্ডটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। আমি অতি সামান্যা স্ত্রী—আমার সঙ্গে আপনার তুল্য গম্ভীর প্রকৃতি রাজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না।

রজা হাস্যত্যাগ না করিয়া বলিলেন, "আমার ন্যায় রাজারই এরূপ রহস্য সম্ভবে। ছয় বৎসর হইল, তুমি একখানি পত্রার্দ্ধ অলঙ্কার মধ্যে পাইয়াছিলে? তাহা কি আছে?"

হি। মহারাজ! আপনি সর্ব্বজ্ঞই বটে। পত্রার্দ্ধ আমার গৃহে আছে।

রা। তুমি শিবিকারোহণে পুনশ্চ গৃহে গিয়া সেই পত্রার্দ্ধ লইয়া আইস। তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্ময়ী রাজার আজ্ঞায় শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তথা হইতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পত্রার্দ্ধ লইয়া পুনশ্চ রাজ,

সরি থানে আসিলেন। রাজা সেই পত্রার্দ্ধ দেখিয়া, আর একখানি পত্রার্দ্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দিলেন। বলিলেন, "উভয় অর্দ্ধকে মিলিত কর।" হিরণ্ময়ী উভয়ার্দ্ধ মিলিত করিয়া দেখিলেন, মিলিল। রাজা কহিলেন, "উভয়ার্দ্ধ একত্রিত করিয়া পাঠ কর।" তখন হিরণ্ময়ী নিম্নলিখিতমত পাঠ করিলেন।

"(জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্ত্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যেনিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ্)। তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে, গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চবৎসর (পর্য্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পতি মুখ-দর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।"

পাঠ সমাপন হইলে, রাজা কহিলেন, "এই লিপি আনন্দস্বামী তোমার পিতাকে লিখিয়াছেন।"

হি। তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। কেন বা, আমা-দিগের বিবাহকালে নয়নাবৃত হইয়াছিল—কেনই বা গোপনে সেই অদ্ভুত বিবাহ হইয়াছিল—কেনই বা পঞ্চবৎসর অঙ্গুরীয়-ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আর ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজা। আর ত অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল।

এদিকে আনন্দস্বামী পাত্রানুসন্ধান করিয়া একটী পাত্র স্থির করি-লেন। পাত্রের কোষ্ঠী গণনা করিয়া জানিলেন যে, পাত্রটীর অশীতি বৎসর পরমায়ু। তবে অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া দেখিলেন যে, ঐ বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহের পঞ্চবৎসরমধ্যে পত্নীশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোনরূপে পঞ্চবৎসর জীবিত থাকেন, তবে দীর্ঘজীবি হইবেন।

অতএব পাত্রের ত্রয়োবিংশতি বৎসর অতীত হইবার সময়ে

বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু এত দিন অবিবাহিত থাকিলে পাছে তুমি কোন প্রকার চঞ্চল হও, বা গোপনে কাহাকে বিবাহ কর, এই জন্য ভয় দেখাইবার কারণে এই পত্রার্দ্ধ তোমার অলঙ্কার-মধ্যে রাখিয়াছিলেন।

তৎপরে বিবাহ দিয়া পঞ্চবৎসর সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য যে যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত আছ। সেই জন্যই পরস্পরের পরিচয় মাত্র পাও নাই।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, বড় গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক মাস হইল, আনন্দস্বামী এ নগরে আসিয়া, তোমার দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার বিবাহ-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। পরে কহিলেন, "আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, হিরণ্ময়ী এরূপ দারিদ্র্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম। এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন। এ বিষয়ে আমাকেই আপনার ঋণী জানিবেন। আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিব। সম্প্রতি আমার আর একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। হিরণ্ময়ীর স্বামী এই নগরে বাস করিতেছেন। উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়. ইহা আপনি দেখিবেন।" এই বলিয়া তোমার স্বামীর পরিচয়ও আমার নিকটে দিলেন। সেই অবধি অমলা যে অর্থব্যয়ের দ্বারা তোমার দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে, তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত। আমি তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে দিয়াছিলাম। হার আমি পাঠাইয়াছিলাম।—সেও তোমার পরীক্ষার্থ।'

হি। তবে আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন? কেনই বা আমার নিকট স্বামীরূপে পরিচয় দিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন? পুরন্দরের গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া কেনই বা অনুযোগ করিতেছিলেন?

রাজা। যে দণ্ডে আমি আনন্দস্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই দণ্ডেই আমি তোমার প্রহরায় লোক নিযুক্ত করিলাম। সেই

কিন্তু অমলা দ্বারা তোমার নিকট হার পাঠাই। তার পর আজ পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবে জানিয়া, তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া কহিলাম, "তোমার বিবাহবৃত্তান্ত আমি সমুদয় জানি। তোমার সেই অঙ্গুরীয়টী লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রের সময়ে আসিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিলন হইবে।" তিনি কহিলেন যে, "মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য" কিন্তু বণিতার সহিত মিলনের আমার স্পৃহা নাই। না হইলেই ভাল হয়।' আমি কহিলাম, 'আমার আজ্ঞা।' তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যে, 'আমার সেই বনিতা সচ্চরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা, তাহা আপনি জানেন। যদি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে আপনাকে অধর্ম্ম স্পর্শিবে। আমি উত্তর করিলাম, 'অঙ্গুরীয়টী দিয়া যাও। আমি তোমার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে বলিব।' তিনি কহিলেন, 'এ অঙ্গুরীয় অন্যকে বিশ্বাস করিয়া দিতাম না, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস নাই।' আমি অঙ্গুরীয় লইয়া তোমার যে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছ।

হি। পরীক্ষা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে রাজপুরে মঙ্গলসূচক ঘোরতর বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, "রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইল—পরীক্ষার কথা পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে তোমার স্বামী আসিয়াছেন; শুভলগ্নে তাঁহার সহিত শুভদৃষ্টি কর।"

তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একজন মহাকায় পুরুষ সেই দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ি, ইনিই তোমার স্বামী।"

হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—জাগ্রত স্বপ্নের ভেদজ্ঞানশূন্যা হইলেন। দেখিলেন, পুরন্দর!

উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত, উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস করিলেন না।

রাজা পুরন্দরকে কহিলেন, "সুহৃৎ, হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্যা স্ত্রী। আদরে গৃহে লইয়া যাও। ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহময়ী। আমি দিবারাত্র ইহাকে প্রহরাতে রাখিয়া-

ছিলাম, তাহাতে বিশেষ জানি যে ইনি অনন্যানুরাগিণী। তোমার চরিত্রের পরীক্ষা করিয়াছি, আমি উঁহার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্যলোভেও হিরণ্ময়ী মুগ্ধ হইয়া তোমাকে ভুলেন নাই। আপনাকে হিরণ্ময়ীর স্বামী বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে, হিরণ্ময়ীকে তোমার প্রতি অসৎপ্রণয়াসক্ত বলিয়া সন্দেহ করি। যদি হিরণ্ময়ী তাহাতে দুঃখিত হইত, 'আমি নির্দোষী আমাকে গ্রহণ করুন,' বলিয়া কাতর হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, হিরণ্ময়ী তোমাকে ভুলিয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা না করিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি কুলটা আমাকে ত্যাগ করুন।' হিরণ্ময়ি! তোমার তখনকার মনের ভাব আমি সকলই বুঝিয়াছিলাম। তুমি অন্য স্বামীর সংসর্গ করিবে না বলিয়াই আপনাকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।'

হি। মহারাজ! আমাকে আর একটী কথা বুঝাইয়া দিন। ইনি সিংহলে ছিলেন, কাশীতে আমার সঙ্গে পরিণয় হইল কি প্রকারে? যদি ইনি সিংহল হইতে সে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা কেহ জানিলাম না কেন?

রাজা। আনন্দস্বামী এবং পুরন্দরের পিতায় পরামর্শ করিয়া সিংহলে লোক পাঠাইয়া ইঁহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত আসেন নাই। এই জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই।

পুরন্দর কহিলেন; "মহারাজ, আপনি যেমন আমার চিরকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অদ্য আমি যেমন সুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে নাই।"

সমাপ্ত।

রাধারাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই। তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়, সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি, ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশলক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচ ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এজন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস. রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া, তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল

না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না; লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়,—পিচ্ছিল—কিছু দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষুঃবারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময় অন্ধকারে অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ?"

পুরুষমানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখী লোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথা গিয়েছিলে?"

রা। আমি রথ দেখতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না। পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায়?" রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত ?"

রাধা। দশ এগার বছর— "তোমার নাম কি ?"

রাধা। রাধারাণী।

"হাঁ রাধারাণী ! তুমি ছেলেমানুষ, একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন ?"

তখন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে ? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী, মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা ? এ যে বড় বড় বড় ঠেকচে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না, দুইটা বই দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্‌মক্ করচে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত ?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌মক্ করচে।

রাধা। তা, আচ্ছা ঘরে গিয়া, প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও; আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তার পর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।" "আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণবদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল,—সকাতরে বলিল—"মা। এখন কি হবে?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় গোর-গোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীর মার কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন

খোঁদ,—পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্সে—একযোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল, বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা! আমার কিসের কাপড়?"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পদ্মলোচন!"—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইঁহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেক বারই ইঁহাদিগের নিকট, যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড় শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বার আনা, আর দুই আনা মুনফা লইতেন।

হাঁ পদ্মলোচন—বলি সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না?" রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি, তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা!" মা দেখিয়া বলিলেন—"একখানা নোট!"

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "হুঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।" রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষর

পরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা?

মা, বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতায় কন্যায় রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে, বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন, এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে প্রিবিকৌন্সিলের আপীল তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে, তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরৎ পাইবেন, এবং তিন আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসংবাদ শুনিয়া রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসংবাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ু শেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনি ভরসা।

আপনি আমার এই অন্তিমকালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন—নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব ?”

কামাখ্যা বাবু অতি ভদ্রলোক, এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, “যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব।” রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যাবাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। “আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া পাঠাইব” এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্যগ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকুমারের দানগ্রহণই তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দানগ্রহণ।

কামাখ্যাবাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া কামাখ্যা বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন দেখিয়া আরও কাতর হইলেন বলিলেন, “আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব ? আপনার যাহা প্রয়োজনীয়, আমি তাহাই করিব।”

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, “আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।”

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, “আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন।”

যিনি মুমূর্ষু, তিনি কামাখ্যাবাবুর চক্ষের জল দেখিয়া তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের

হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যাবাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে "এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত-এজন্য দারিদ্র্যা বস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দরিদ্র নাই: সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যাবাবু রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনরক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যাবাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন।

কালেক্‌টর সাহেব রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যাবাবু বিবেচনা করিলেন আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্ম্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যাবাবুর কৌশলে কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক — বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল! তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল বলে কারে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাঁহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখা-পড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরমাসুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যাবাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্বজানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারিকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সময়বয়স্কা; এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত সলজ্জভাবে অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে?"

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন?"

বসন্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। সে কি? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যাবাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহাভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞতাস্বীকারের যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবী দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি কত বয়স, তাহা কেহ জানে না। তাহার পরিবার সন্তান-আদি থাকিবারই সম্ভাবনা, রুক্মিণীকুমারের বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সেই রাত্রি অবধি রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে! এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরের ভিতর এমন দিন প্রায়ই যায় নাই যে, রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যাবাবু মনে মনে ভাবিলেন, "ইহা একটা বাতিক! ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয় রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করা।"

কামাখ্যাবাবু রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায় তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে দেশে আপনার মোয়াক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—

"বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণীবাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না। ইত্যাদি—"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণী কুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কই, রুক্মিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল—কামাখ্যাবাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, দ্বিতীয়বার পিতৃহীনা হইলেন মনে করিলেন। কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধাদির পর রাধারাণী আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যাবাবুর বিচক্ষণতা হেতু রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লইয়াই রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে তাঁহার নিজ গ্রামে একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হউক – "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ।"

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দারিদ্রাবস্থায় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেন না, যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে সে গ্রামে তার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজ গ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর— আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন, দুঃখী, অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুই এক বৎসর পর একজন ভদ্রলোক সেই অনাথ-নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া অতি ধীর, গম্ভীর, এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদের" দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন; রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে। এখানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ" বলে।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন-দুঃখীলোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি?"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "বন্দোবস্ত দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নসত্র দিয়াছে? রুক্মিণীকুমার কি তাঁহার নাম?"

রক্ষকেরা বলিল, "একজন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ' বলে কেন?"

রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কার নাম?" "কাহারও নয়।"

"যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার নিবাস কোথায়?" রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা যাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে, তিনি পুরুষমানুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন? রাগ করিও না—এখন অনেক বড়মানুষের মেয়ে মেম-লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রক্ষকেরা উত্তর করিল—"ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না।"

প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে ধীরে রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত; বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটা হীরক-অঙ্গুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্ম্মচারিকগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল, বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন, কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। বলিলেন, "এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওয়ানজি বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, আবার অল্প-বয়স্কা। এজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।" আগন্তুক বলিল, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ানজি পত্র পড়িলেন - "প্রিয় ভগিনি !

এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও — ভয় করিও না। যেমত যেমত ঘটে, আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যাবাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া কেহ আর কিছু বলিল না—পত্র অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহকবাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইল। রাধা-রাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষমানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া একজন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর একজন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল যে, তাঁহার বর্ণটুকু গৌর, স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর, তাঁহার শরীর দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল; কপাল দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, ঘন, দূরায়ত, এবং নিবিড় কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ, এবং উন্নত; ওষ্ঠা-ধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র, এবং কোমল; গ্রীবা দীর্ঘ, অথচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলিগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তুকের উচিত প্রথম কথা কহা—কেন না, তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি

এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিল, "আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয়, আপনি জানেন।"

আগন্তুক একখানি অতি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যা বাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমারসম্বন্ধে সেই বিজ্ঞাপন। রাধারাণী দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারিকেলপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তুকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া মনে ভাবিলেন ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু?"

আগন্তুক বলিলেন, "না"। 'না' শব্দ শুনিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসনগ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আগন্তুক বলিলেন, "না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম—তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিল, "যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতুকের জন্য। আজ আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—

"যথার্থ রুক্মিণীকুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমাকেই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যা বাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।" 'পরে?'

"পরে কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম। কৌতুকবশতঃ বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল?' কামাখ্যাবাবুর পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম,—এক বালিকা—আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্য আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—" বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিল, "ইতর লোকের কথায় এমন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।"

আগন্তুক উত্তর করিলেন, "রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসারে কেহ দেবকন্যা থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যদি কাহাকে পবিত্র, সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী—যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত! বর্ণে বর্ণে অপ্সরার বীণা বাজে, যেন কথা কহিতে বাধ বাধ করে, অথচ সকল কথা পরিষ্কার, সুমধুর,—অতি সরল! আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই—এমন কথা কখনও শুনি নাই।"

রুক্মিণীকুমার—এক্ষণে ইহাকে রুক্মিণীকুমারই বলা যাউক—ঐ সঙ্গে মনে মনে বলিলেন, "আবার আজ বুঝি তেমনি কথা শুনিতেছি!"

রুক্মিণীকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আজি এতদিন হইল, সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, ঠিক আজিও সে কণ্ঠ আমার

মনের ভিতর জাগিতেছে। যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজি এই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই? আমি মূর্খ! কোথায় সেই দীন-দুঃখিনী কুটীরবাসিনী ভিখারিণী, আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদ-বিহারিণী ইন্দ্রাণী। আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতরাং জানি না যে, সে সুন্দরী কি কুৎসিতা, কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশও রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!

এদিকে রাধারাণী অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতেছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্ নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে? এত দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত হইয়াছ? তুমি কি অন্তর্যামী? নাহলে আমি লুকাইয়া লুকাইয়া, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

এই প্রথম, দুইজনে স্পষ্ট দিবালোকে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুইজনে দুইজনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা নদনদীবিচিত্রা, জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল, অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন আর আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্তে মুহূর্তে অভিনব মাধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব—কখন দেখি নাই, আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?

রাধারাণী বলিল,—বড় কষ্টে বলিতে হইল, কেন না, চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে—রাধারাণী বলিল, "তা আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তাত এখনও বলেন নাই।"

হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা ? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে ; প্রাণেশ্বর ! দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব ! চির-বাঞ্ছিত ! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে ; আবার যাকে সেই সঙ্গে "হাঁ গা, সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা" বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে 'আপনি,' 'মশাই,' 'দর্শন দিয়াছেন,' এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা ? তোমরা পাঁচজন, রসিকা প্রেমিকা বাক্‌চতুরা বয়োধিকা, ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচজনে বল দেখি, ছেলে মানুষ রাধারাণী কেমন ক'রে কথা কয় গা ?

রাধারাণী মনে মনে একটু পরিতাপ করিল, কেন না, কথাটা একটু ভর্ৎসনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—

"তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাত্রে জোনাকির—ন্যায়—একটু আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়।"

"তোমার রাধারাণী।" রাধারাণী ছল ধরিয়া চুপি চুপি এই কথাটী বলিয়া মুখ নত করিয়া, ঈষৎ ঈষৎ হাসিল। হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা ? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

রুক্মিণীকুমারও মনে ছল ধরিল—এ তুমি বলে কেন ? কে এ ? প্রকাশ্যে বলিল, "আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।"

রাধারাণী বলিল, "হৌক, আপনারই রাধারাণী।"

রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, 'সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যা-বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে ? কামাখ্যাবাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয়, অনিচ্ছুক ছিলেন ; কেবল বলিলেন, 'আমাদিগের কোন আত্মীয়ার কন্যা।' যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান

করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই কি? যদি প্রয়োজন হয়, ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, 'কেন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারকে খুঁজিতেছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন; বোধ করি, আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।' এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, "আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন, যে, 'এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন। রাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন।' আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি?"

রাধারাণী বলিল, "জানি না। বোধ হয় যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে, তাহা আমি চিনি কি না বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি আমা হইতে কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।"

রুক্মিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজদত্ত অর্থ-বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন—

"স্পষ্ট কথা মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে রাধারাণীর বন্ধুবন্ধা কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কেন না, আপনাকে দয়ালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া অবশ্য তাহার কিছু আনুকূল্য করিতেন। কই, আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না?"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সে দিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম; পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায়

পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহ্নে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায়, বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধাণীকেই দিয়াছিলাম; কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরে সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

রা। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে: বোধ হয়, সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে বৃষ্টি-বাদলে আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইতে হইয়াছিল: আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য, রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল,—আমি সেই অবসরে তাহার বস্ত্র কিনিতে আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন?

রু। আর কি দিব? একখানা ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রা। নোটখানি ওরূপ দেওয়া বিবেচনা সিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।

রু। না, আমি পেনসিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, "রাধারাণীর জন্য।" তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, "রুক্মিণীকুমার রায়।" যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে—এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটী তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে রাধারাণী আপনার শ্রীচরণদর্শন জন্য—

এইটুকু বলিতেই—আ ছি ছি—রাধারাণী ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন বৃষ্টির জল ভরা থাকে, ফুলটী নীচু করিলেই ঝড়্ ঝড়্ করিয়া

পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল অমনই যেদিকে রুক্মিণীকুমার ছিলেন; সেই দিকে মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেল। রুক্মিণীকুমার বোধ হয়, চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই, কি পাইয়াই থাকিবেন, বলা যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাহিরে আসিয়া মুখে চক্ষে জল দিয়া অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া রাধারাণী ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, "ইনিই ত রুক্মিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। দুইজনে দুজনের জন্য মন তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন উপায়? আমি যে রাধারাণী, তা উঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি—তার পর? উনি কি জাতি, তা কে জানে? জাতিটা এখনই জানিতে পারা যায়। কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন! তবে ধর্ম্ম-বন্ধন ঘটিবে না, চিরন্তনের যে বন্ধন, তাহা ঘটিবে না, প্রাণের বন্ধন ঘটিবে না। তবে আর উঁহার সঙ্গে কথায় কাজ কি; না হয় এ জন্মটা রুক্মিণীকুমার নাম জপ করিয়া কাটাইব। এত দিন সেই জপ করিয়া কাটাইয়াছি; জোয়ারের প্রথম বেগটা কাটিয়া গিয়াছে—বাকি কাল কাটিবে না কি?"

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধারাণীর আবার নাকের পাটা কাঁপিয়া উঠিল—ঠোঁট দুখানা ফুলিয়া উঠিল—আবার চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আবার সে জল দিয়া মুখ-চোক ধুইয়া তোয়ালিয়া দিয়া মুছিয়া ঠিক হইয়া আসিল। রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিল—

"আচ্ছা! যদি আমার জাতিই হন, তাহলেই বা ভরসা কি? উনি ত দেখিতেছি বয়ঃপ্রাপ্ত—কুমার, এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না! না! তা হইবে না। নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল, সতীন সহিতে পারিব না।

"তবে এখন কর্ত্তব্য কি? জাতির কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াইবা কি হইবে? তবে রাধারাণীর পরিচয়টা দিই। আর উনি কে, তাহা জানিয়া লই, কেন না, রুক্মিণীকুমার ত ওঁর নাম নয়—তা ত শুনিলাম। যে নাম জপ করিয়া মরিতে হইবে, তা শুনিয়া লই। তার পর বিদায় দিয়া কাঁদিতে বসি। আ! পোড়ারমুখী বসন্ত না বুঝিয়া, না জানিয়া এ সামগ্রী কেন পাঠাইলি? জানিস্ না কি এ জীবন সমুদ্র অমন করিয়া মন্থন করিতে গেলে কাহারও কপালে অমৃত কাহারও কপালে গরল উঠে?

"আচ্ছা! পরিচয়টা ত দিই।" এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা প্রাণের অধিক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া আনিল। সে সেই নোটখানি। বলিয়াছি, রাধারাণী তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিল। রাধারাণী তাহা আঁচলে বাঁধিল। বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতে লাগিল, "আচ্ছা, যদি মনের বাসনা পূরিবার মতনই হয়? তবে শেষে কথাটা কে বলিবে?" এই ভাবিয়া রাধারাণী আপনা আপনি হাসিয়া কুটপাট হইল। "অ, ছি—ছি—ছি! তা ত আমি পারিব না বসন্তকে যদি আনাইতাম! ভাল, উঁহাকে এখন দুদিন বসাইয়া রাখিয়া বসন্তকে আনাইতে পারিব না? উনি না হয় সে দুই দিন আমার লাইব্রেরী হইতে বহি লইয়া পড়ুন না! পড়া-শুনা করেন না কি? ওঁরই জন্য ত লাইব্রেরী করিয়া রাখিয়াছি। তা যদি দুই দিন থাকিতে রাজি না হন? উঁহার যদি কাজ থাকে? তবে কি হবে? ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয়? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন্ কাজটাই করি? এই যে উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে করলেম না, এতে কে না কি বলে? আমি ত বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কুমারী;—তা এ কাজটাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল!"

তার পর রাধারাণী বিষণ্ণমনে ভাবিল, "তা যেন হলো, তাতেও বড় গোল! মোমবাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে পুরুষ মানুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথাটা না পাড়েন? না পাড়েন, তবে—তবে হে ভগবান্! বলিয়া দাও, কি

করিব! লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ—যে আগুনে আমি পুড়িতেছি তাহাও তুমি গড়িয়াছ।—এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না? তুমি এই সহায়হীনা, অনাথাকে দয়া করিয়া, পবিত্রতার আবরণে আমাকে আবৃত করিয়া, লজ্জার আবরণ কাড়িয়া লও। তোমার কৃপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ বুঝি সে কথাও শুনিলেন, বিশুদ্ধচিত্তে যাহা বলিবে, তাহাই বুঝি তিনি শুনেন। রাধারাণী মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে গজেন্দ্রগমনে রুক্মিণীকুমারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রুক্মিণীকুমার তখন বলিলেন, "আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও যান নাই, আমি যে কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পারি নাই। তাই এখনও যাই নাই।"

রাধা। আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমার মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে, সত্য বটে। সে আপনার নিকট পরিচিত হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম।

রু। তার পর?

রাধারাণী তখন, অল্প একটু হাসিয়া, একবার আপনার পায়ের দিকে চাহিয়া, আপনার হাতের অলঙ্কার খুঁটিয়া, সেই ঘরে বসান একটা প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিকৃতি পানে চাহিয়া, রুক্মিণীকুমারের পানে না চাহিয়া, বলিল—

"আপনি বলিয়াছেন, রুক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে। রাধারাণীর যে আরাধ্য দেবতা, তাহার নাম পর্য্যন্ত এখনও সে শুনিতে পায় নাই।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আরাধ্য দেবতা কে বলিল?"

রাধারাণী কথাটা অনবধানে, বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন সামসাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "নাম ঐরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধারাণী গুপ্তভাবে দুই হাত যুক্ত করিয়া মনে মনে ডাকিল, "জগদীশ্বর! তোমার কৃপা অনন্ত! প্রকাশ্যে বলিল, "রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "অমন সকলেই রাজা কব্‌লায়; আমাকে যে কুমার বলে, সে যথেষ্ট সম্মান করে।"

রা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার স্বজাতি। এখন স্পর্দ্ধা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই।

দেবেন্দ্র। সে কথা পরে হবে। রাধারাণী কৈ?

রা! ভোজনের পর সে কথা বলিব।

দে। মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না।

রা। রাধারাণীর জন্য এত দুঃখ? কেন?

দে। তা জানি না, বড় দুঃখ—আট বৎসরের দুঃখ—তাই জানি!

রা। হঠাৎ রাধারাণীর পরিচয় দিতে আমার কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। আপনি রাধারাণীকে পাইলে কি করিবেন?

দে। কি আর করিব? একবার দেখিব।

রা। একবার দেখিবার জন্য এই আট বৎসর এত কাতর?

দে। রকম রকমের মানুষ থাকে।

রা। আচ্ছা, আমি ভোজনের পরে আপনাকে আপনার রাধারাণী দেখাইব। ঐ বড় আয়না দেখিতেছেন; উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন না।

দে। চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি? আমি যে আট বৎসর কাতর!

ভিতরে ভিতরে দুই জনে দুই জনকে বুঝিতেছেন কি না জানি না, কিন্তু কথাবার্ত্তা এইরূপ হইতে লাগিল। রাধারাণী বলিতে লাগিল, "সে কথাটায় তত বিশ্বাস হয় না। আপনি আট বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়স কত?"

দে। এগার হইবে।"

রা। এগার বৎসরের বালিকার উপর এত অনুরাগ?

দে। হয় না কি? রা। কখনও শুনি নাই।

দে। তবে মনে করুন কৌতূহল! রা। সে আবার কি?

দে। শুধুই দেখিবার ইচ্ছা।

রা। তা দেখাইব, ঐ বড় আয়নার ভিতর। আপনি বাহিরে থাকিবেন।

দে। কেন, সম্মুখ সাক্ষাতে আপত্তি কি?

রা। সে কুলের কুলবতী। দে। আপনিও ত তাই।

রা। আমার কিছু বিষয় আছে। নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করি। সুতরাং সকলের সম্মুখেই আমাকে বাহির হইতে হয়। আমি কাহারও অধীন নই। সে তাহার স্বামীর অধীন, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত— দে। স্বামী?

রা। হাঁ, আশ্চর্য্য হইলেন যে? দে। বিবাহিতা?

রা। হিন্দুর মেয়ে—উনিশ বৎসর বয়স—বিবাহিতা নহে;

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেক্ষণ মাথায় হাত দিয়া রহিলেন। রাধারাণী বলিলেন, "কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন?

দে। মানুষ কি না ইচ্ছা করে?

রা। এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি?

দে। রাণীজি কেহ ইহার ভিতর নাই। রাধারাণী-সাক্ষাতের অনেক পূর্ব্বেই আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

রাধারাণী আবার যুক্তকরে ডাকিল, "জয় জগদীশ্বর! আর ক্ষণকাল যেন আমার এমনই সাহস থাকে।" প্রকাশ্যে বলিল, "তা শুনিলেন ত, রাধারাণী পরস্ত্রী। এখনও কি তাহার দর্শন অভিলাষ করেন?"

দে। করি বৈ কি। রা। সে কথাটা কি আপনার যোগ্য?

দে। রাধারাণী আমার সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা এখনও আমার জানা হয় নাই।

রা। আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার পরিশোধ করিবে বলিয়া। আপনি শোধ লইবেন কি?

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে পারি।

রা। কি কি দিয়াছেন? দে। একখানা নোট।

"এই নিন্।" বলিয়া রাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, তাঁহরা হাতে লেখা রাধারাণীর নাম সে নোটে আছে। দেখিয়া বলিলেন, "এ নোট কি রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন?"

রা। রাধারাণী কুমারী; স্বামীর কথাটা আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছে।

দে। তা সব ত শোধ হইল না।

রা। আর কি বাকি? দে। দুইটা টাকা, আর কাপড়।

রা। সব ঋণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার না করিয়া চলিয়া যাইবেন। পাওনা বুঝিয়া পাইলে কোন্ মহাজন বসে? ঋণের সে অংশ ভোজনের পর রাধারাণী পরিশোধ করিবে।

দে। আমার যে এখনও অনেক পাওনা বাকি!

রা। আবার কি?

দে। রাধারাণীকে মনঃপ্রাণ দিয়াছি—তা ত পাই নাই।

রা। অনেক দিন পাইয়াছেন। রাধারাণীর মনঃপ্রাণ আপনি অনেক দিন লইয়াছেন—তা সে দেনাটা শোধ-বোধ গিয়াছে।

দে। সুদ কিছু পাই নাই? রা। পাইবেন বৈ কি।

দে। কি পাইব?

রা। শুভলগ্নে, সুতহিবুকযোগে এই অধম নারীদেহ আপনাকে দিয়া, রাধারাণী ঋণ হইতে মুক্ত হইবে।

এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

যথাবিহিত সময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধা-রাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজ-নান্তে রাধারাণী বলিলেন, "আপনার নগদ দুইটা টাকা ও কাপড় এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি; টাকা খরচ করিয়াছি। আর ফেরত দিবার যো নাই। তাহার বদলে যাহা আপনার জন্য রাখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া রাধারাণী বহুমূল্য হীরকহার বাহির করিয়া দেবেন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিতে গেলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি ঐরূপে দেনা পরিশোধ করিবে, তবে তোমার গলায় যে ছড়া আছে, তাহাই লইব।"

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলার হার খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইল। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সব শোধ হইল—কিন্তু আমি একটু ঋণী রহিলাম।"

রাধা। কিসে?

দে। সেই দুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরৎ পাই-লাম। তবে এখন মালা ফেরৎ দিতে আমি বাধ্য।

রাধারাণী হাসিল।

দেবেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন. তাহা রাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ফেরৎ দিলাম।"

এমন সময়ে পোঁ, করিয়া শাঁক বাজিল। রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শাঁক বাজাইল কে?"

তাঁহার একজন দাসী, চিত্রা উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমি।"

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাজাইলি?"

চিত্রা বলিল, "কিছু প্রাইব বলিয়া।"

বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিল।

তার পর দুইজনে বিরলে বসিয়া মনের কথা হইল। রাধারাণী দেবেন্দ্রনারায়ণের বিস্ময় দূর করিবার জন্য সেই রথের দিনের সাক্ষাৎ